৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

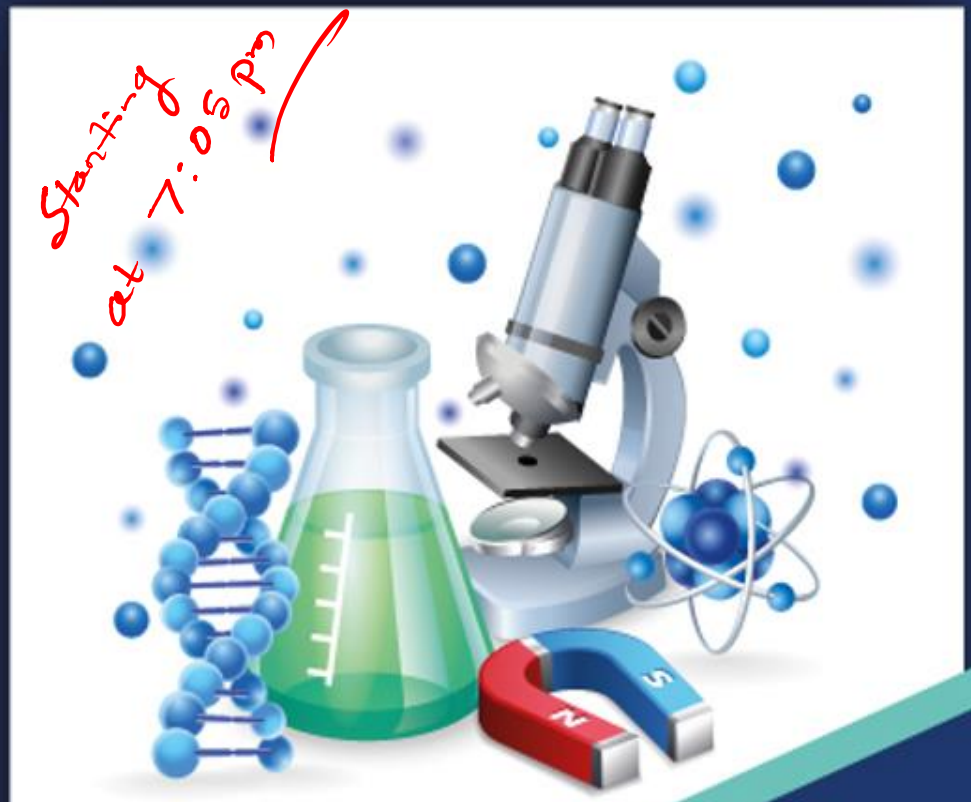

লেকচার: ০৭ + ০৮

টপিক:

- ✓ রোগ ও স্বাস্থ্যসেবা (Disease & Health Care)
- ✓ অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ (Acid, Base & Salt)
- ✓ বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

আলোচ্য বিষয়

- **রোগ ও স্বাস্থ্যসেবা (Disease & Health Care):** অভাবজনিত রোগ, সংক্রমণ, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, রক্তচাপ, উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া, মাদকাসক্তি, ভ্যাকসিনেশন, চোখের ত্রুটি, খাদ্যের বিষক্রিয়া, এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাফি, সিটিস্ক্যান, এমআরআই, ইসিজি, এন্ডোসকপি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, অ্যানজিওগ্রাফি এবং তাদের ব্যবহার, সতর্কতা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, ক্যান্সার, এইডস ও হেপাটাইটিসের মৌলিক ধারণা।
- **অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ (Acid, Base & Salt):** অ্যাসিড ও ক্ষারকের ধারণা, অ্যাসিড ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য, অম্ল- ক্ষারনির্দেশক, প্রাত্যহিক জীবনে অ্যাসিড ও ক্ষারকের ব্যবহার এবং সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা, অ্যাসিডের অপব্যবহারের সামাজিক প্রভাব, পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটির কারণ এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন, pH, বস্তুর pH -এর পরিমাপ এবং গুরুত্ব, লবণ, লবণের বৈশিষ্ট্য, প্রাত্যহিক জীবনে লবণের প্রয়োজনীয়তা, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে লবণের ব্যবহার।
- **বায়ুমণ্ডল (Atmosphere):** জীবমণ্ডল ও বারিমণ্ডল, আয়নমণ্ডল, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের ভূমিকা, মিঠা ও দূষিত পানি, পাস্তুরাইজেশন।

অভাবজনিত রোগ

❑ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগ

পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ	পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ
শর্করা	দুর্বলতা	Vitamin B_{12}	রক্তশূন্যতা
আমিষ	মেরাসমাস	Vitamin C	স্কার্ভি
স্নেহ পদার্থ	বিভিন্ন চর্মরোগ	Vitamin D	রিকেটস, অস্টিওম্যালাশিয়া
Vitamin A	রাতকানা রোগ, জেরপথ্যালমিয়া	Vitamin E	প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, অকাল গর্ভপাত
Vitamin B_1	বেরিবেরি	Vitamin K	রক্তপাত বন্ধ না হওয়া
Vitamin B_2	ঠোঁটের কোণায় ও মুখের চারদিকে ঘা	ক্যালসিয়াম	Osteoporosis
Vitamin B_3	Pellagra	ফ্লোরাইড	দাঁতের ক্ষয়
Vitamin B_5	Paresthesia	আয়রন	রক্ত শূন্যতা
Vitamin B_6	রক্তশূন্যতা	পটাশিয়াম	উচ্চ রক্তচাপ
Vitamin B_7	এক্সিমা, চর্মরোগ	আয়োডিন	গলগণ্ড
Vitamin B_9	রক্তশূন্যতা		

সংক্রামক রোগ

- **বায়ু বাহিত রোগ:** SARS-COV-2, চিকেনপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা।
- **পানি বাহিত রোগ:** বোটুলিজম, কলেরা, আমাশয়।
- **প্রাণী বাহিত রোগ:** বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, এনথ্রাক্স।
- **যৌন বাহিত রোগ:** এইডস, গনোরিয়া, সিফিলিস ।
- **স্পর্শ জনিত রোগ:** স্ক্যাবিস, দাদ, খোস-পাচড়া।

সংক্রামক রোগ

- COVID-19

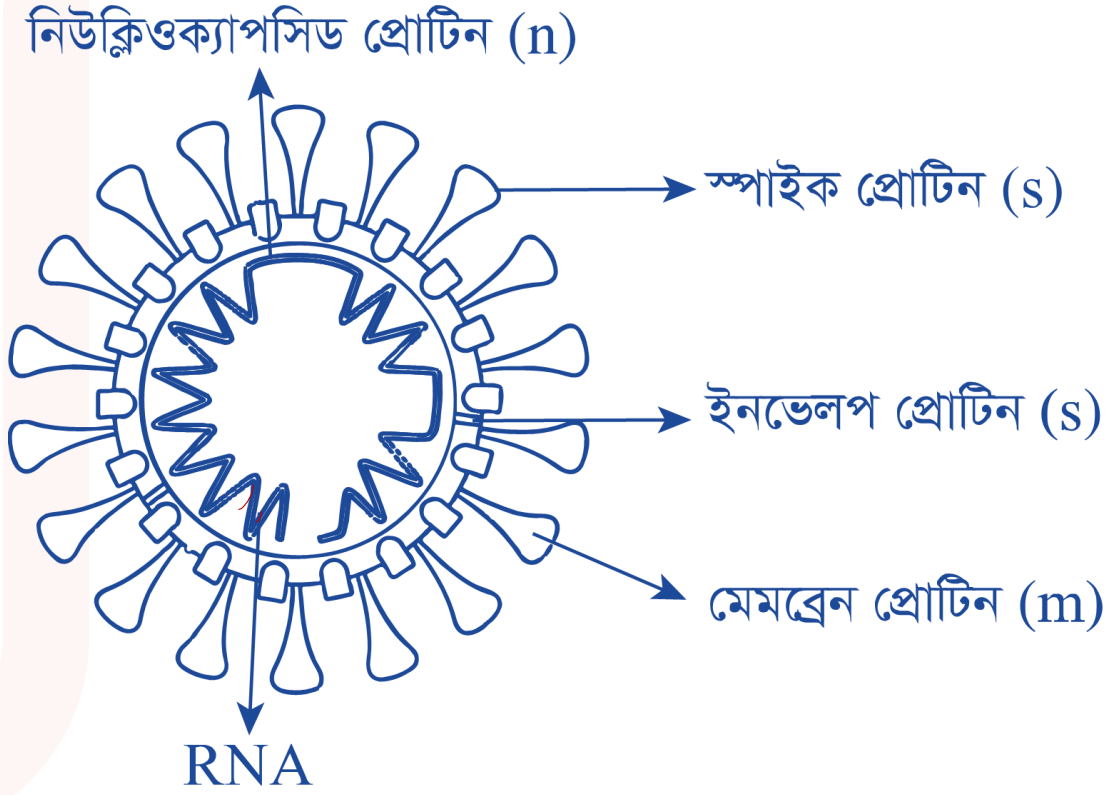

অ্যান্টিসেপটিক

❑ অ্যান্টিসেপটিক

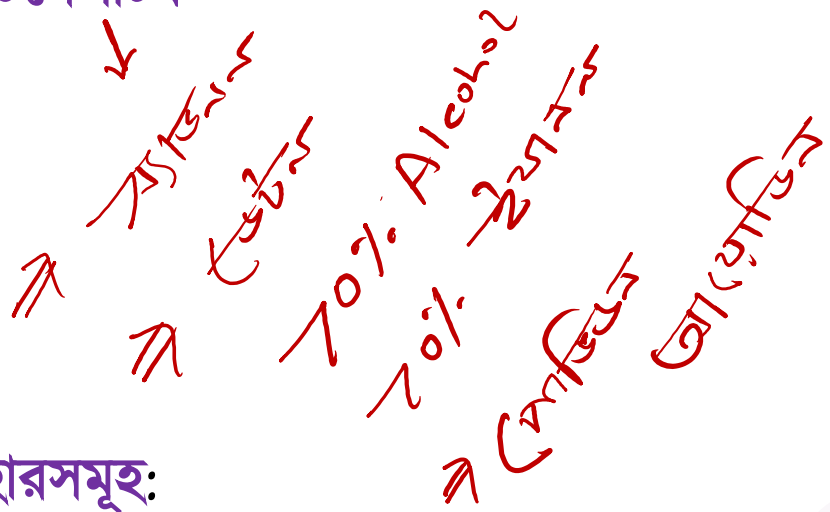

❑ ব্যবহারসমূহ:

- ✓ ত্বকে সংক্রমণ রোধ করা, বিশেষত ক্ষতস্থান বা ছোটখাটো পোড়ার জন্য।
- ✓ হাত জীবাণুমুক্তকরণ।
- ✓ চিকিৎসা পদ্ধতির আগে ত্বক পরিষ্কার করা, যেমন- সার্জারি।
- ✓ মাউথওয়াশ বা লজেন্স দিয়ে গলা সংক্রমণের চিকিৎসা করা।
- ✓ সংক্রমণ চিকিৎসা করতে বা ক্যাথেটার ব্যবহার করার আগে শ্লেষ্মা ঝিল্লি পরিষ্কার করা।

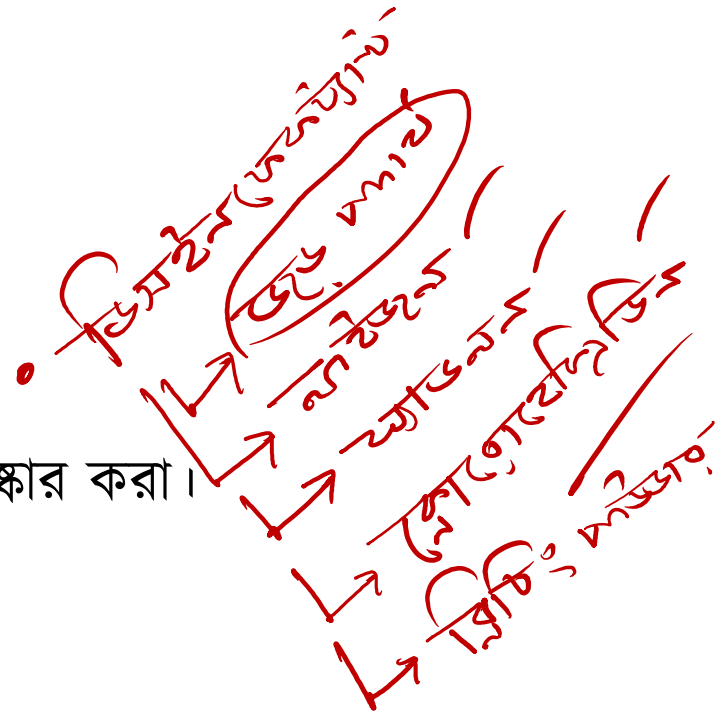

অ্যান্টিবায়োটিক

❑ অ্যান্টিবায়োটিক

✓ **রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টিবায়োটিক:** বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে আন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

- **মূত্রনালির সংক্রমণ (Urinary Tract Infection)**
- **যক্ষ্মা (Tuberculosis)**
- ~~**ছত্রাক সংক্রমণ (Fungal Infection)**~~

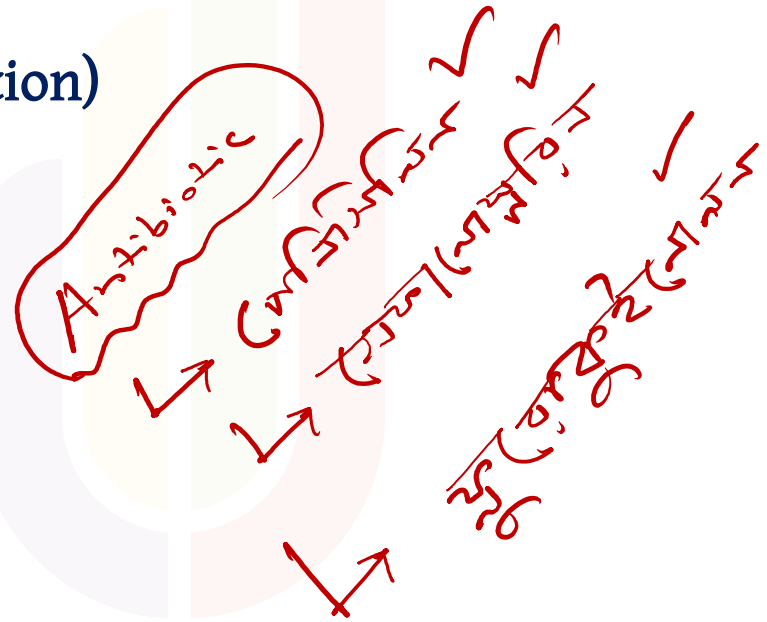

অ্যান্টিবায়োটিক

- **এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব ও প্রতিরোধ:** রোগাক্রান্ত দেহকে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাইরে থেকে যে সাহায্য আমরা নেই তার নাম এন্টিবায়োটিক। এটি ব্যাকটেরিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে বা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া নষ্ট করে এমনকি কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। এন্টিবায়োটিক সাধারণত নির্দিষ্ট সময় ধরে সেবন করলে জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়। তবে সময়ের আগে এন্টিবায়োটিক সেবন ত্যাগ করলে যে সকল জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়নি তারা ঐ এন্টিবায়োটিককে চিনে ফেলে। তারা তখন নিজেদের দেহে এমন কিছু পরিবর্তন করে ফেলে যে ঐ এন্টিবায়োটিক পরবর্তীতে আর তাদের উপর কাজ করে না বা জীবাণু ঔষধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে। এন্টিবায়োটিক খেতে হলে কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায়, মিডিয়ায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে। স্বাস্থ্য বিভাগ ও ঔষধ প্রশাসনের এমন পদক্ষেপ নেয়া দরকার যেন উপযুক্ত প্রেসক্রিপশন ব্যতীত কেউ এন্টিবায়োটিক সংগ্রহ করতে না পারে। চিকিৎসকগণ কেন এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছেন সেটিও ভেবে দেখা জরুরি। এছাড়া গবাদি পশু, মাছ চাষ ও ফসলী জমিতে যে এন্টিবায়োটিকগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে সেগুলো মানুষের শরীরে ঔষধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব ঘটাচ্ছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।

অ্যান্টিবায়োটিক

❑ অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিব্যাক্টোরিয়াল ও অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে তুলনা:

অ্যান্টিসেপটিক	অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল	অ্যান্টিবায়োটিক
➢ এটি সংক্রামক রোগবীজ নাশক পদার্থ যা জীবিত টিস্যুর উপর প্রয়োগ করা হয় যাতে ইনফেকশন এড়ানো সম্ভব হয়।	➢ অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা ত্বকের বহিঃআবরণ পরিষ্কার করে ব্যাক্টেরিয়া দূরীভূত করতে ব্যবহৃত হয়।	➢ যে জৈব রাসায়নিক ঔষধ দেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিশেষ কোনো ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস বা বৃদ্ধিরোধ করে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক বলে।
➢ খোলা ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় জীবাণুমুক্ত করতে।	➢ ত্বকের বহিঃআবরণ পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।	➢ দেহের অভ্যন্তরীণ ও কিছু ক্ষেত্রে বহিরাবরণীতে বিদ্যমান ব্যাক্টেরিয়া নাশ করতে ব্যবহৃত হয়।
➢ টিংচার আয়োডিন, ৭০% ইথানল, ফেনল, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, পোভিডন প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টিসেপটিক।	➢ ইথাইল অ্যালকোহল, সাবান প্রভৃতি অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল গুণ ধারণ করে।	➢ পেনিসিলিন, সেফালোস্পরিন, [illegible] ইত্যাদি অ্যান্টি বায়োটিকের উদাহরণ।

স্ট্রোক

❑ স্ট্রোক

স্ট্রোক ব্রেন বা মস্তিষ্কের রোগ, হৃদরোগ নয়। মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালির দুর্ঘটনাই হলো স্ট্রোক। এ দুর্ঘটনায় রক্তনালি বন্ধও হতে পারে, আবার ফেটে গিয়ে রক্তপাতও ঘটতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বিকল হয়ে যায়। ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশনের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি ২ সেকেন্ডে ১ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং প্রতি ৪ সেকেন্ডে ১ জন মৃত্যুবরণ করেন। স্ট্রোক দু'ধরনের-

১. রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। একে বলে হেমোরেজিক স্ট্রোক।

২. রক্তনালি ব্লক হয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত না যাওয়া এবং ঐ অংশ শুকিয়ে যাওয়া। একে বলে ইস্কেমিক স্ট্রোক।

❑ স্ট্রোকের কারণ

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, হাই-প্রেসার, হাই-কোলেস্টেরল, ধূমপান, পারিবারিক স্ট্রোকের ইতিহাস, হার্টের অসুখ যেমন- অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, রক্তজমাট বাঁধা অসুখ, ক্যান্সার ইত্যাদি আরও অনেক কারণ রয়েছে স্ট্রোকের। ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক কংগ্রেসে বলা হয়েছে, দশটা রিস্ক ফ্যাক্টর কারণ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ৯০ শতাংশ স্ট্রোক এড়ানো সম্ভব। হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের প্রধান কারণ। শুধু উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করলে স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব ৫০ শতাংশ।

স্ট্রোক

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে। অনেক রোগী উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক দেখে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেন। যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় চার গুণ বেশি।

ডায়াবেটিস রোগীদের খালি পেটে ব্লাড সুগার ১০০-১২০ মিলিগ্রামের নিচে এবং খাবার দুই ঘণ্টা পর ১৪০-১৬০ মিলিগ্রাম রাখা ভালো। ডায়াবেটিস রোগীদের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তিন গুণ বেশি, আর আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে বেশি।

❑ স্ট্রোকের লক্ষণ:

- ✓ শরীরের একদিকে দুর্বল বা অবশ হয়ে যাওয়া।
- ✓ কথা অস্পষ্ট, জড়িয়ে যাওয়া বা একেবারে বুঝতে ও বলতে না পারা।
- ✓ চোখে ঝাপসা দেখা, দুটি প্রতিবিম্ব দেখা বা একেবারেই না দেখা।
- ✓ হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম, ঘোরা, হতবিহ্বল হয়ে পড়া বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।
- ✓ মারাত্মক লক্ষণ হলো হঠাৎ তীব্র মাথা ব্যথা, বমি, খিঁচুনি বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা।

স্ট্রোক

স্ট্রোক একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। একবার আক্রান্ত হলে চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি। তাই প্রতিরোধই উত্তম।

- **স্ট্রোক প্রতিরোধ:** স্ট্রোক ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে ধূমপান, জর্দা, গুল, মাদক পরিহার করতে হবে। ধূমপান রক্তনালি সংকুচিত করে স্ট্রোক ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরও পাঁচ বছর পর্যন্ত ঝুঁকি থেকে যায়। নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস জীবনকে পরিবর্তন করে। স্ট্রোক প্রতিরোধের কার্যকরী পন্থা হলো নিয়মিত ব্যায়াম করা।

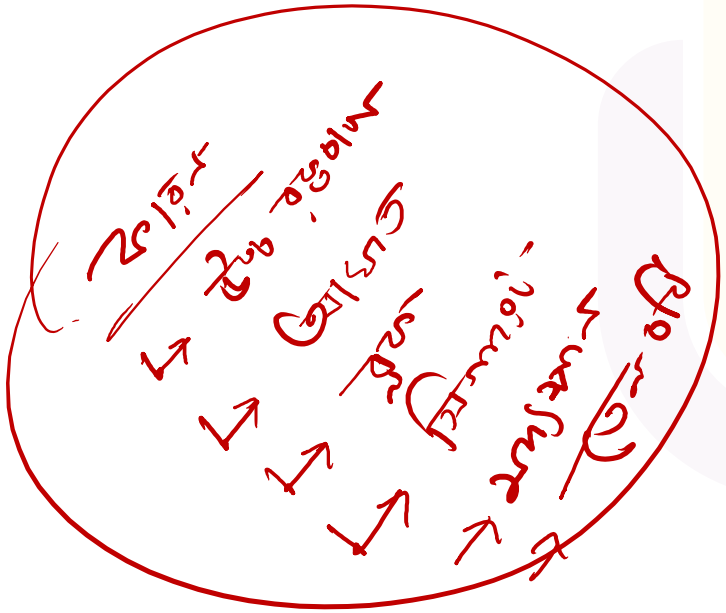

❑ হার্ট অ্যাটাক

যখন হৃৎপিণ্ডের কোনো শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করে তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়। বয়স, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা, অতিরিক্ত মেদ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান, মানসিক চাপ-এগুলি মূলত হার্ট অ্যাটাকের কারণ। অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক হলেও সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। সমস্যা হল কখনও কখনও বুকে কোনো ধরনের ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, ফলে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা তা খুব ভাল করে বোঝা যায় না। হার্ট অ্যাটাকের অন্যান্য লক্ষণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- ✓ ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা।
- ✓ অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া।
- ✓ বদহজমের সমস্যা।
- ✓ বুকে চাপ ধরা ভারি ভাব অনুভব করা।
- ✓ পেটের উপরের অংশে ব্যথা।

হার্ট অ্যাটাক

❑ Coronary by Pass

মানবদেহে তিনটি বড় ধমনিসহ আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধমনি দ্বারা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। যদি কোনো কারণে দুটি বা তিনটি বৃহৎ ধমনি দ্বারাই রক্তপ্রবাহ আংশিক বন্ধ হয়ে যায় তবে সাধারণত যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় থাকে Coronary by Pass বলে। ধমনি সংকুচিত হলে বা চর্বি জমে বা জমাট রক্তে পূর্ণ হলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় শরীরের অন্য স্থান থেকে শিরা কেটে এনে বাঁধাপ্রাপ্ত স্থানের উপর থেকে নিচে জোড়া লাগানো হয়। এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি।

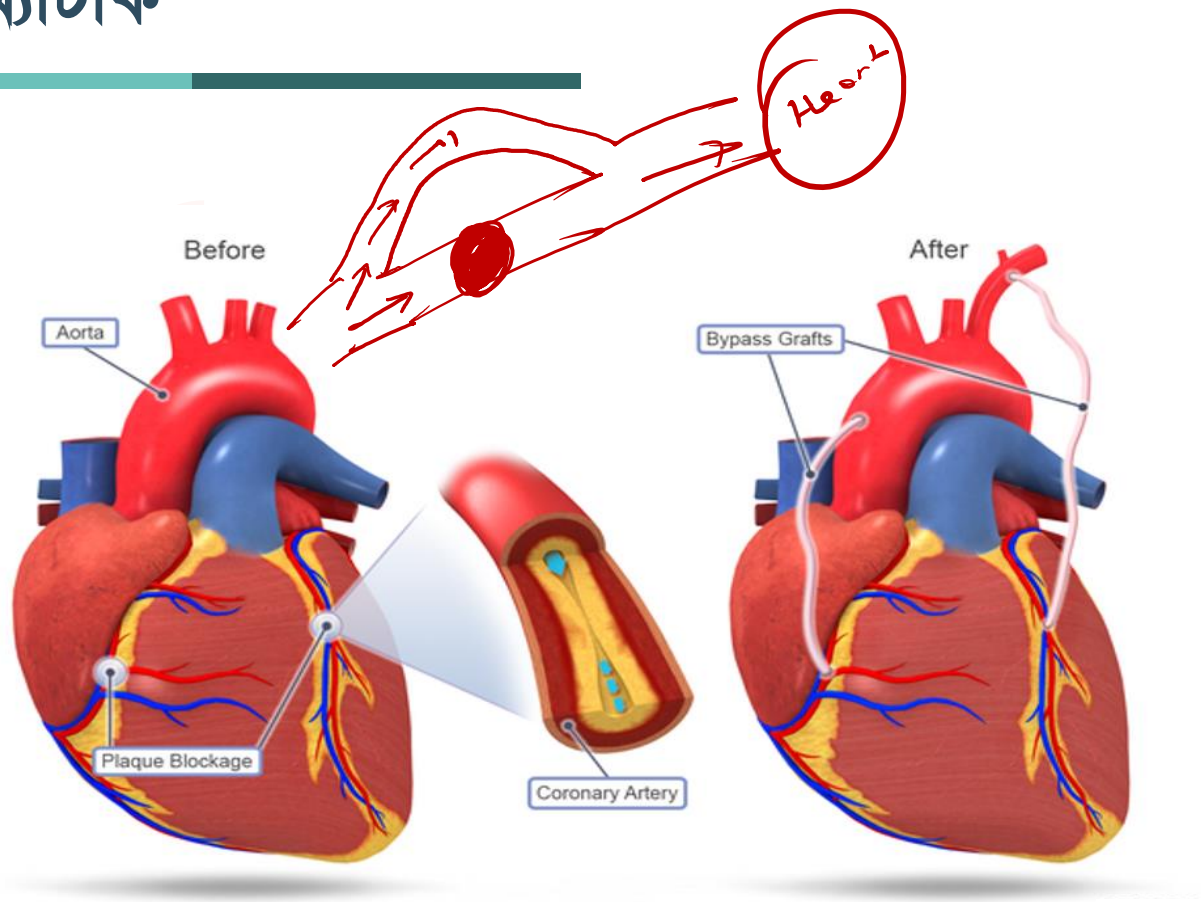

হার্ট অ্যাটাক

❑ Angioplasty

মানবদেহের তিনটি বড় ধমনির মধ্যে যে কোন একটি ধমনি দ্বারা রক্ত চলাচল বাঁধাপ্রাপ্ত হলে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করানো হয় তাকে Angioplasty বলে। এ পদ্ধতিটি Coronary by Pass অপেক্ষা সহজ পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সংকুচিত ধমনির স্থান বিশেষকে বেলুনের দ্বারা প্রসারিত করা হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। এটি স্থায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি।

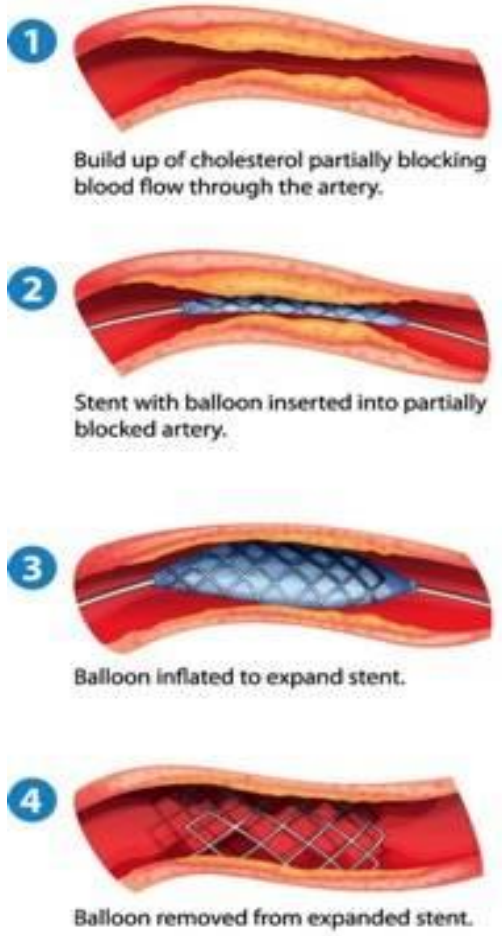

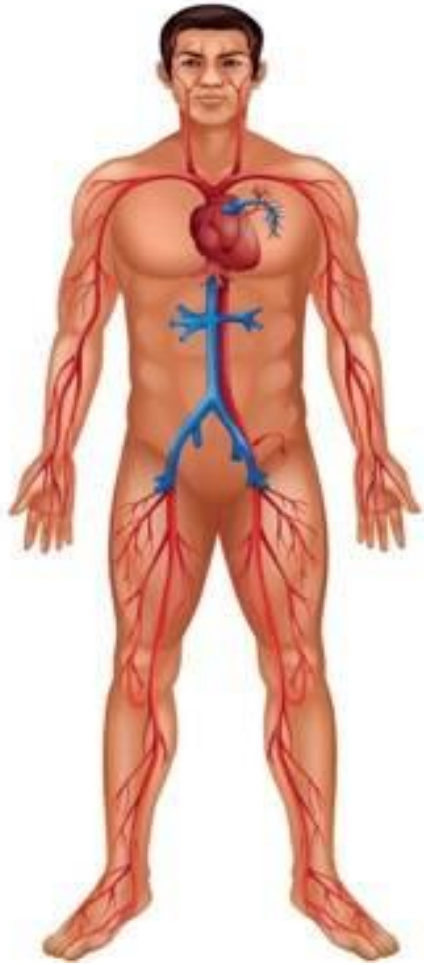

রক্তচাপ

❑ রক্তচাপ

OBSERVATION	SYSTOLIC	DIASTOLIC
NORMAL	90–129	60–79
STAGE 1	130–139	80–89
STAGE 2	140–179	90–109
CRITICAL	OVER 180	OVER 110

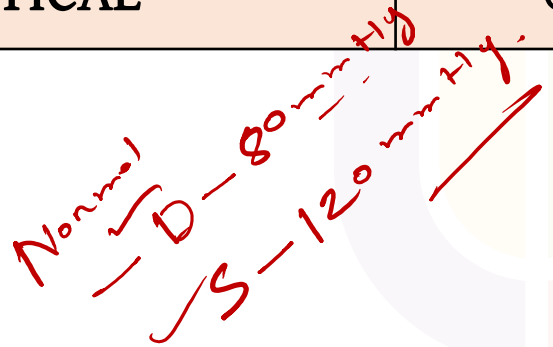

রক্তচাপ

❑ উচ্চ রক্তচাপ

- **ঝুঁকি:** শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ওপর স্বল্প থেকে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এই উচ্চ রক্তচাপ। বিশেষত স্ট্রোক, হৃদক্রিয়া বন্ধ, চোখের ক্ষতি এবং বৃক্ক বা কিডনি বিকলতা ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।
- **কারণ:** অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, অতিরিক্ত মেদ, কাজের চাপ বা টেনশন, মদ্যপান, অতিরিক্ত আওয়াজ, ঘিঞ্জি পরিবেশ ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। আবার এটি বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত একটি অসুখও। প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার কারণ হিসেবে লবণের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়।
- **করণীয়:** চিকিৎসকরা মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের রক্তচাপের জন্য ওজন কমানো, ধূমপান ছেড়ে দেওয়া এবং নিয়মিত হালকা ব্যায়ামকে চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসেবে ধরেন। যদিও ধূমপান ছেড়ে দেওয়ায় সরাসরি রক্তচাপ কমে না; কিন্তু উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত, কারণ এটি ছেড়ে দিলে উচ্চ রক্তচাপের বেশ কিছু উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে আসে। যেমন- স্ট্রোক অথবা হার্ট অ্যাটাক। মৃদু উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। ফল, শাকসবজি, স্নেহবিহীন দুগ্ধজাত খাদ্য এবং নিম্নমাত্রার লবণ ও তেলজাতীয় খাদ্য উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া পরিবেশগত চাপ যেমন উঁচু মাত্রার শব্দের পরিবেশ বা অতিরিক্ত আলো পরিহার করাও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপকারী।

হৃদরোগ

❑ **হৃদরোগের কারণ:** আমাদের হৃৎপিণ্ডে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা হৃদযন্ত্রে আসে ধমনি দিয়ে। সেটি যখন সরু হয়ে যায়, তখন নালীর ভেতরে রক্ত জমাট বেধে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে হৃদযন্ত্রের পেশিগুলো দুর্বল হয়ে যায়, ফলে আর সে অক্সিজেন প্রবাহিত করতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে অক্সিজেন প্রবাহিত না হতে পারলেই হার্ট অ্যাটাক হয়।

❑ **প্রতিরোধ:**

✓ খাবার ও জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে হবে, নিয়মিত হাঁটা-চলা ও ব্যায়াম করতে হবে, সক্রিয় থাকতে হবে।

✓ ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

✓ নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে।

✓ ধূমপান বন্ধ করতে হবে।

✓ মাঝে মাঝে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ডায়াবেটিস

❑ ডায়াবেটিস

আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন এর তথ্যমতে, ডায়াবেটিস এমনই একটি রোগ, যা কখনো সারে না। কিন্তু এই রোগকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আইরিশ ইনডিপেনডেন্টের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, যখন আমরা কার্বোহাইড্রেট বা সাধারণ শর্করাজাতীয় খাবার খাই, তখন তা ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়। ইনসুলিন হচ্ছে একধরনের হরমোন। এর কাজ হলো এই গ্লুকোজকে মানুষের দেহের কোষগুলোয় পৌঁছে দেওয়া। এরপর সেই গ্লুকোজ ব্যবহার করে শরীরের কোষগুলো শক্তি উৎপাদন করে। সেই শক্তি দিয়েই রোজকারের কাজকর্ম করে মানুষ। সুতরাং যখন এই গ্লুকোজ শরীরের কোষে পৌঁছাবে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হবে।

যখন কারও ডায়াবেটিস হয়, তখন তার শরীরে ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে দেহের কোষে গ্লুকোজ পৌঁছাতে পারে না। এতে করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণত প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্লুকোজ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই কারণে ডায়াবেটিস রোগীর ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। যখন প্রস্রাব বেশি হয়, তখন ডায়াবেটিসে ভোগা রোগী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়ার রোগীর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ গ্লুকোজ বের হয়ে যায়। এতে করে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করতে পারে না দেহের কোষগুলো। ফলে রোগী দুর্বলতা অনুভব করেন। রোগী যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে তার রক্তনালী, স্নায়ু, কিডনি, চোখ ও হৃদযন্ত্রের সমস্যাসহ নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ডায়াবেটিস

❑ ডায়াবেটিসের লক্ষণ:

➢ ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।
➢ তৃষ্ণা পাওয়া।
➢ নিয়মিত খাওয়ার পরও ঘন ঘন খিদে।
➢ প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত অনুভব করা।
➢ চোখে ঝাপসা দেখা।
➢ শরীরের বিভিন্ন অংশের কাটাছেঁড়া সহজে সারে না।
➢ খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া।
➢ হাতে-পায়ে ব্যথা বা মাঝে মাঝে অবশ হয়ে যাওয়া।

ডায়াবেটিস

❑ ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ:

➢ টাইপ-১

➢ টাইপ-২

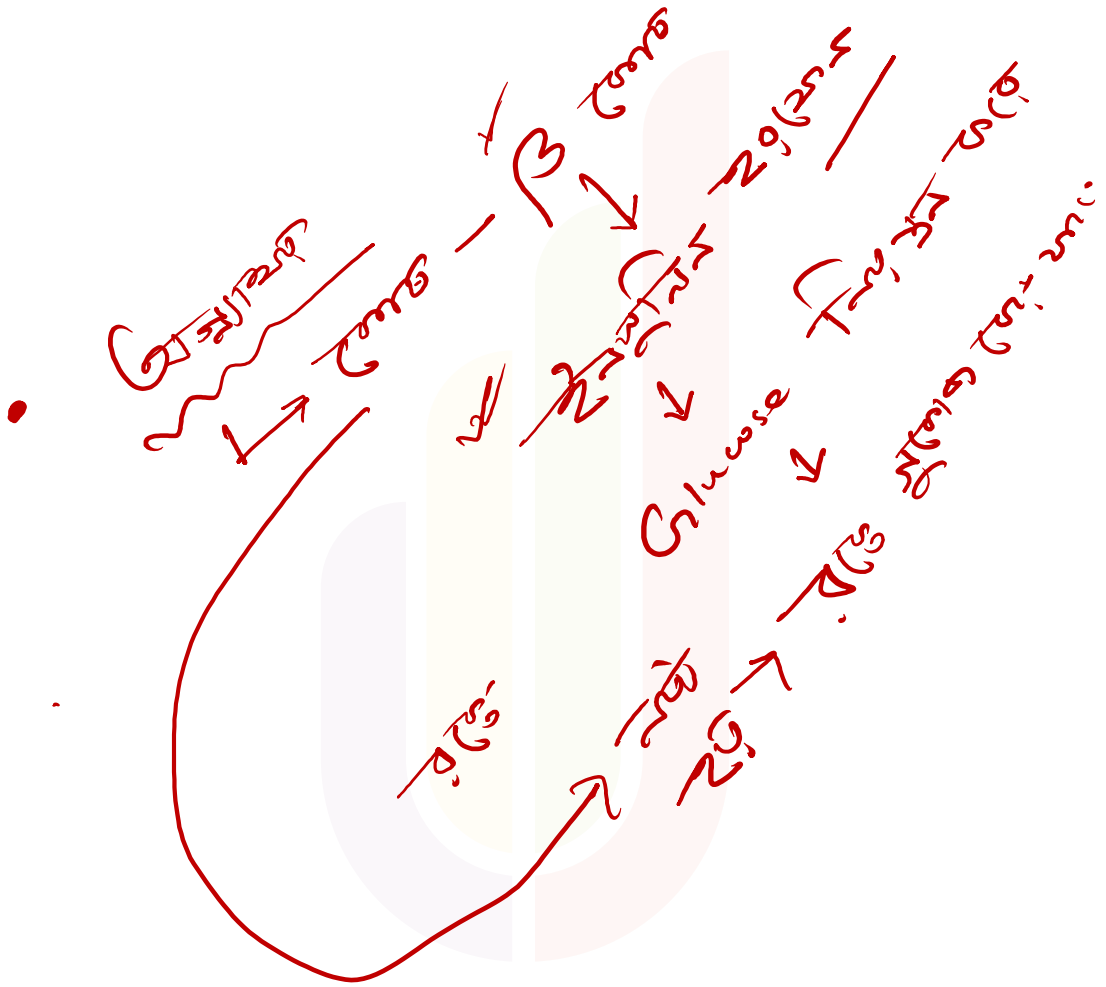

ডায়াবেটিস

❑ ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ-

- পিতা মাতা বা পরিবারের কেউ বা রক্তসম্পর্কিত কারোর যদি থাকে।
- কারোর ওজন বেশি থাকলে।
- কারোর যদি উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে।
- জেনেটিক কোনো কারণে ইনসুলিন যদি কমে যায়।
- অন্যান্য হরমোন ঘটিত কারণে।
- স্টেরওয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের কারণে।

ডায়াবেটিস

❑ ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য তালিকা

- চিনি বা মিষ্টি পরিত্যাগ করতে হবে।
- কার্বহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার কম খাওয়া।
- ক্যালরিযুক্ত খাবার পরিমাণ মত খাওয়া।
- নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, অনিয়ম না করা।
- অভুক্ত না থাকা, অল্প অল্প করে বারবার খাওয়া।
- তেতো জাতীয় খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়া।
- ধূমপান পরিত্যাগ করা।
- ফাস্টফুড পরিত্যাগ করা।

ডায়াবেটিস

❑ ইনসুলিন

❑ কাজ

- ইনসুলিন দেহের বিভিন্ন কোষে গ্লুকোজের অনুপ্রবেশ ঘটায়।
- গ্লুকোজের জারণ বৃদ্ধি করে।
- গ্লাইকোজেনকে সংশ্লেষিত করে।
- রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তের চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ডেঙ্গু

❑ ডেঙ্গু

ডেঙ্গু জ্বরের উৎপত্তি RNA ভাইরাস ডেঙ্গু বা ডেঙ্গি থেকে। Aedes Aegypti নামক মশা এই ভাইরাসের বাহক ও সংক্রামক। এই মশার কামড়ের মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস মানুষের রক্তে প্রবেশ করে অণুচক্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আক্রান্ত অনুচক্রিকা সুস্থ অনুচক্রিকাকে আক্রমণ করে এবং নষ্ট করে দেয়। ফলে রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ হ্রাস পায়। এভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে সেই মশাও ভাইরাসের বাহকে পরিণত হয় এবং রোগ সংক্রামণে সহায়তা করে।

❑ ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরে সাধারণত তীব্র জ্বর ও শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, হাড়, কোমড়, অস্থিসহ মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। হেমোরোজিক জ্বরের ক্ষেত্রে চামড়ার নিচে রক্ত জমে, নাক ও মাড়ি দিয়ে এবং বমি ও পায়খানার সাথে রক্ত পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে কিডনি ফেইলিউর পর্যন্ত হতে পারে।

ডেঙ্গু

❑ ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বরের মধ্যে পার্থক্য

ডেঙ্গু	চিকুনগুনিয়া
➢ ডেঙ্গু জ্বরে শরীরে কাঁপুনি, ঘাম ও তীব্র অবস্থায় রক্তক্ষরণ হয়।	➢ চিকুনগুনিয়া জ্বরে সাধারণত এগুলো হয় না।
➢ মাংসপেশিতে ব্যথা হলে ডেঙ্গু জ্বর হওয়ার আশঙ্কা বেশি।	➢ হাতের আঙুলের জয়েন্টে, পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হলে চিকুনগুনিয়া হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
➢ ডেঙ্গু হলে পুরো শরীরে র‍্যাশ হয়।	➢ চিকুনগুনিয়ায় হাত-পা ও মুখমণ্ডলে র‍্যাশ হয়।
➢ ডেঙ্গু জ্বরে রক্তের অণুচক্রিকার সংখ্যা অনেক কমে যায়।	➢ চিকুনগুনিয়ায় রক্তের অণুচক্রিকার সংখ্যা ততটা কমে না।
➢ ডেঙ্গু জ্বরে অস্থিসন্ধির ব্যথা জ্বর কমে যাওয়ার পর কমে যায়।	➢ চিকুনগুনিয়া জ্বরে অস্থিসন্ধির ব্যথা জ্বর কমে যাওয়ার পরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। চিকুনগুনিয়া জ্বর ভালো হলেও রোগটি অনেক দিন ধরে রোগীদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
➢ একই মশা দিয়ে চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু জ্বর হলেও ডেঙ্গুতে মৃত্যু ঝুঁকি হয়।	➢ চিকুনগুনিয়া হলে কারো মৃত্যু হয় না।

ডেঙ্গু

❑ প্রতিরোধ

যেহেতু ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া মশাবাহিত রোগ, তাই মশার বংশ বৃদ্ধিরোধ, নিধন ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গুজ্বর ভাইরাস গঠিত রোগ। অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ শুধুমাত্র ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর হয় না। আর এই মশা সাধারণত পরিষ্কার পানিতে বংশ বৃদ্ধি করে। আর তাই ঘরবাড়ি ও এর চারপাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ক্যান, টিনের কৌটা, মাটির পাত্র, বোতল, নারকেলের মালা ও এ-জাতীয় পানি ধারণ করতে পারে। সুতরাং এমন পাত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে, যেন পানি জমতে না পারে। গোসলখানায় বালতি, ড্রাম, প্লাস্টিক ও সিমেন্টের ট্যাঙ্ক কিংবা মাটির গর্তে চার-পাঁচ দিনের বেশি কোনো অবস্থাতেই পানি জমিয়ে রাখা যাবে না। পরিষ্কার ও স্থবির পানিতে ডেঙ্গুর জীবাণু বেশি জন্মায়। ঘরের আঙিনা, ফুলের টব, বারান্দা, বাথরুম, ফ্রিজের নিচে ও এসির নিচে জমানো পানি নিয়মিত পরিষ্কার করা, যাতে মশা বংশবৃদ্ধি করতে না পারে।

ডায়রিয়া

❑ ডায়রিয়া

❑ সংক্রামক ডায়রিয়ার কারণ:

- ভাইরাসজনিত
- ব্যাক্টেরিয়াজনিত
- পরজীবীজনিত

ডায়রিয়া

- **চিকিৎসা ব্যবস্থা:** তীব্র ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে, তীব্র এবং সম্ভাব্য সংক্রামক ডায়রিয়ার সব রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে, যাতে পরিবারের অন্য কারো মধ্যে এটা ছড়াতে না পারে। তীব্র ডায়রিয়ার চিকিৎসায় প্রধানত তিনটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যথা:

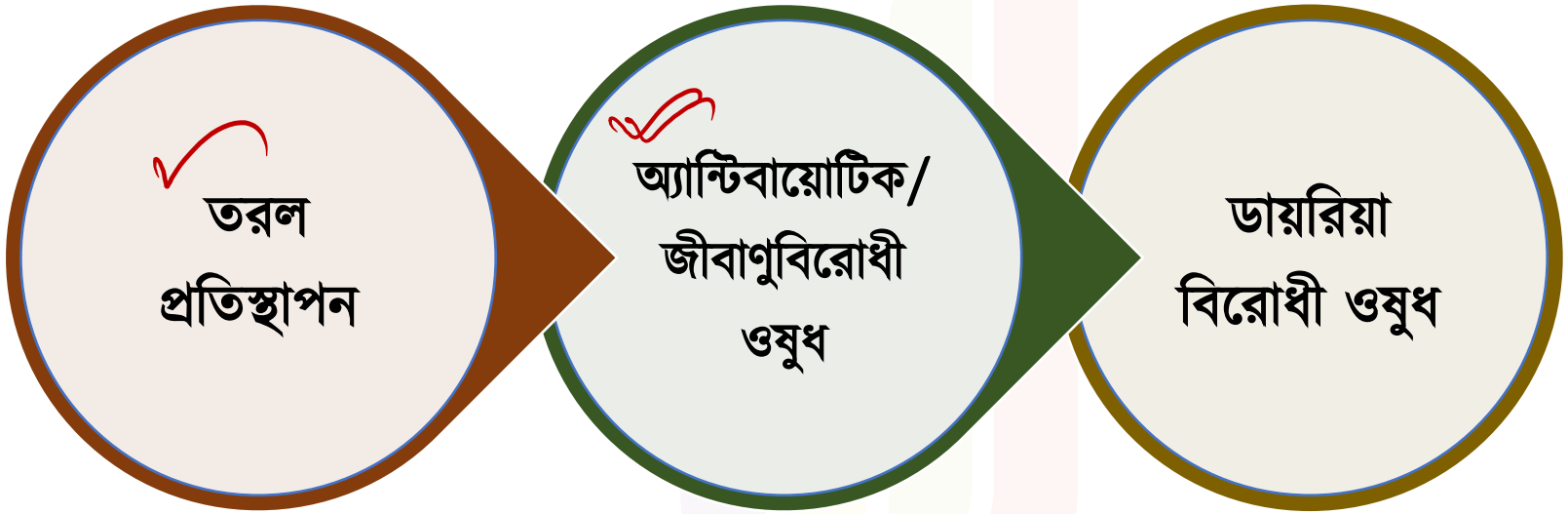

চোখের ছানি

❑ চোখের ছানি রোগ

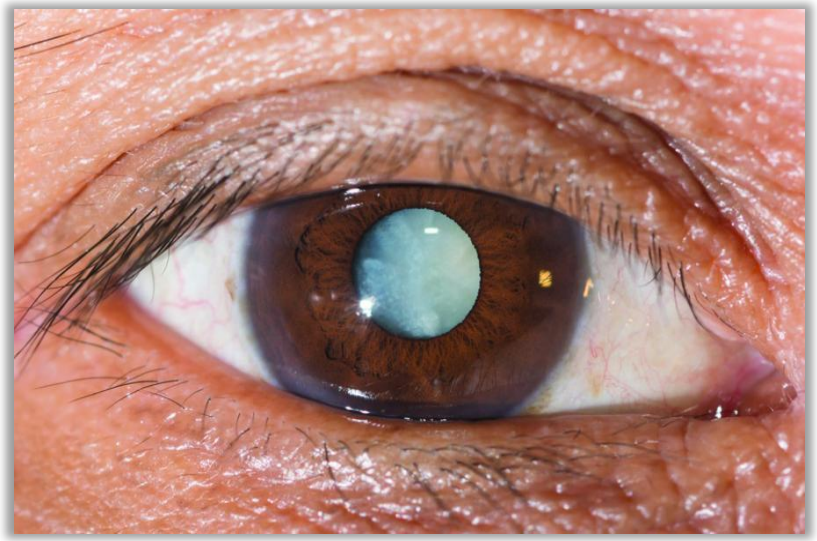

➢ ছানিরোগের কারণ:

- ✓ বার্ধক্যজনিত কারণে লেন্সের গঠনগত পরিবর্তন।
- ✓ চোখে আঘাত, চোখে ঘন ঘন প্রদাহ।
- ✓ অপুষ্টি, অনিয়ন্ত্রিত স্টেরয়েড বা হরমোন থেরাপি।
- ✓ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস।
- ✓ পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদি।

❑ খাদ্যে বিষক্রিয়া

খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ:

- ✓ খাদ্য ভালভাবে রান্না না করা বিশেষ করে পোল্ট্রি বা বিভিন্ন ধরনের মাংস ভালভাবে সিদ্ধ করা না হলে।
- ✓ খাবার তৈরি বা পরিবহন বা সরবরাহের সময় হাত ভাল করে না ধুলে।
- ✓ রান্না করা খাবার দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করলে কিংবা রেফ্রিজারেটরে রাখলে।
- ✓ পচনশীল খাবার নির্ধারিত তারিখের পরও ব্যবহার করলে।
- ✓ অসুস্থ কারো স্পর্শ করা খাবার খেলে। এছাড়া এমন কোন ব্যক্তির স্পর্শ করা খাবার খেলে যে অসুস্থ কারো সংস্পর্শে গিয়েছিল।

খাদ্যে বিষক্রিয়া

❑ খাদ্যে বিষক্রিয়া রোধে করণীয়:

- ✓ প্যাকেটে নির্ধারিত তারিখ শেষ হওয়ার আগেই খাবার খেয়ে ফেলতে হবে।
- ✓ খাবার নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এটা সাধারণত ফ্রিজে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। একবার রান্না করার পর বা প্যাকেট খোলার পর নির্ধারিত সময়েই (সাধারণত ২ দিন) তা খেয়ে শেষ করতে হবে।
- ✓ সব সময় কাঁচা এবং রেডি-টু-ইট বা কিনেই খাওয়া যায় এমন খাবার আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ✓ যে স্থানে খাবার রান্না ও প্রস্তুত করা হয় সেই স্থানটি নিয়মিত গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষ করে মাংস রান্না করার পর এটি অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত।
- ✓ খাবার রান্না করার সময় পোষা প্রাণী রান্না ঘরের বাইরে রাখতে হবে। রান্না ঘরে ঢুকে গেলেও প্রয়োজনমতো সেটি পরিষ্কার করতে হবে।
- ✓ খাবার স্পর্শ করার আগে, টয়লেট থেকে ফিরে, পোষা প্রাণীকে ধরার পর কিংবা ময়লা ফেলার পর গরম পানি এবং সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

চোখের ত্রুটি

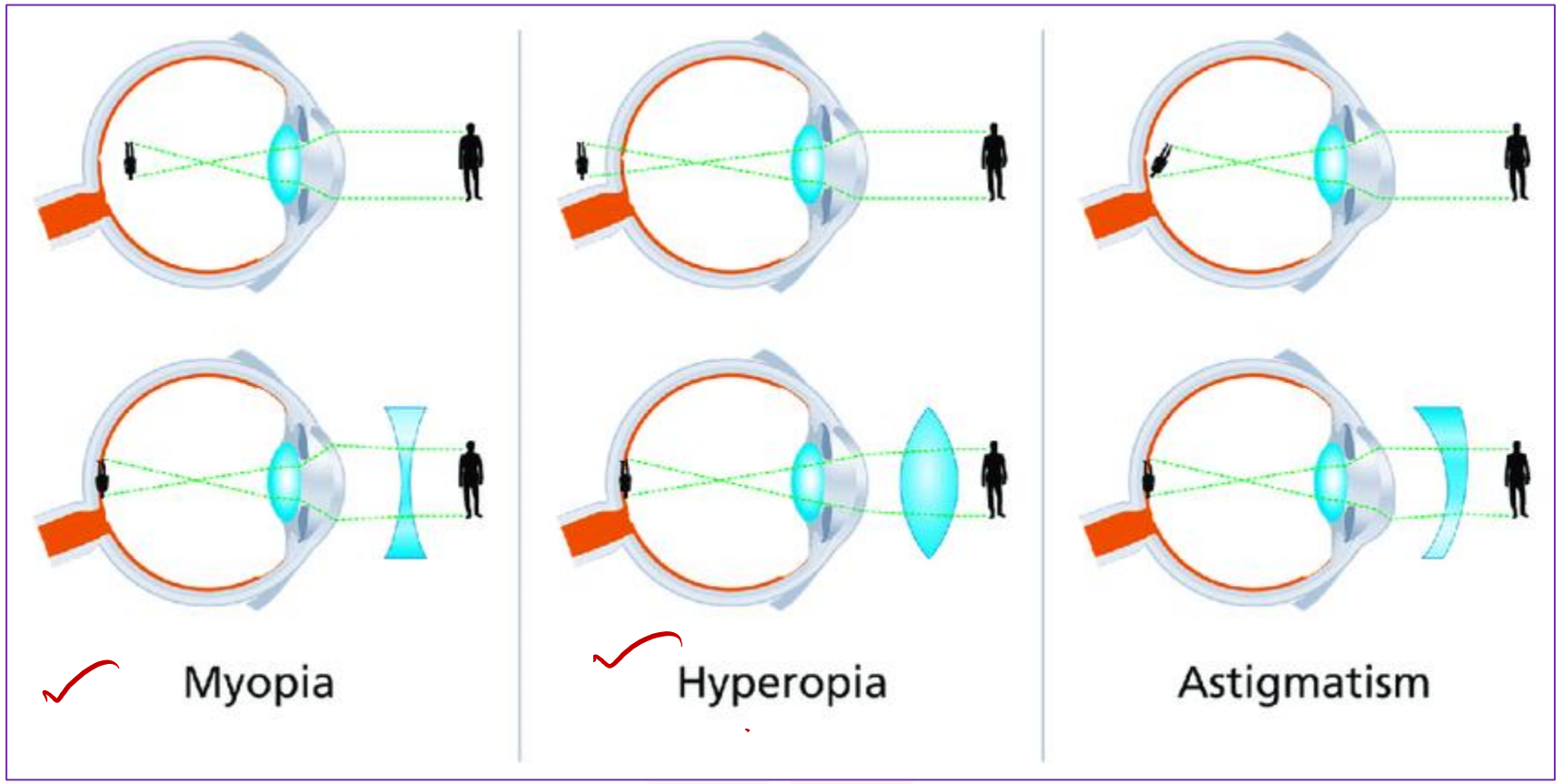

এক্স-রে (X-RAY)

❑ এক্স-রে (X-ray)

➢ **এক্স-রে ইমেজিং:** এক্স-রের বিভিন্ন ধাতুর প্রতিভেদ্য ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন পরীক্ষার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। যেকোনো গাঁথুনিতে ফাটল কিংবা অসামঞ্জস্যতা নির্ণয়ে এক্স-রে ইমেজিং গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। রেডিয়েশনের প্রভাবে সহজেই যেকোনো গঠনের সূক্ষ্ম ফাটল কিংবা অসামঞ্জস্যতা ফিল্ম বা ডিটেক্টরে স্পষ্ট ছবি তৈরি করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রে এই পদ্ধতিতেই যুগের পর যুগ রোগ নির্ণয় করে আসছে। এছাড়া এক্স-রে যাত্রাপথের নিরাপত্তার কাজেও ব্যাপক জনপ্রিয়। কার্গো, লাগেজ কিংবা স্বয়ং যাত্রীর শরীরে ইলেকট্রনিক ইমেজিং এর ম্যাধমে রিয়েল টাইম ভিজুয়াল তৈরি করে যার ফলে তৎক্ষণাৎ অবৈধ বস্তুর সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তবে এক্স-রে ইমেজিংয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবহার দেখা যায় চিকিৎসাক্ষেত্রে। শরীরের টিস্যুর মাঝ থেকে হাড়ের কিংবা অভ্যন্তরীণ গঠনের ইমেজিং এর মাধ্যমে এক্স-রে চিকিৎসকদের রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

➢ **এক্স-রে থেরাপি:** সাধারণ রেডিয়েশন থেরাপি ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের DNA ভাঙ্গনের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। তবে এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সুস্থ কোষের DNA ধ্বংস হবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমেরিকান পরিবেশ প্রতিরক্ষা সংস্থার মতে, এক্স-রে যে কোনো নির্দিষ্ট একটি অংশের অণু পরমাণু থেকে সকল ইলেকট্রন সফলভাবে সরিয়ে নিতে সক্ষম। পর্যাপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এটি মানবশরীরের যে কোনো কোষকেও ধ্বংস করতে সক্ষম। যদিও এক্স-রের ব্যবহারে ক্যান্সার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, একইসাথে ক্যান্সারের প্রতিরোধেও এক্স-রে দারুণ কার্যকরী। ক্যান্সার টিউমারে এক্স-রে নিক্ষেপণের মাধ্যমে ক্যান্সারের অস্বাভাবিক কোষ সহজে ধ্বংস করা সম্ভব।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি

❑ আল্ট্রাসনোগ্রাফি

❖ আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার:

- **গর্ভাবস্থা:** আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে বাচ্চা ডেলিভারির তারিখ থেকে শুরু করে বাচ্চার গঠন-প্রকৃতি, লিঙ্গ, মায়ের সম্ভাব্য কোন অসংগতি যা বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর, মায়ের পেটের ভিতর বাচ্চার অবস্থান, বাচ্চার নড়াচড়া, জমজ বাচ্চাসহ বিভিন্ন বিষয় জানা যায়। গর্ভকালীন যেকোনো ইমার্জেন্সিতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি একজন চিকিৎসকের জন্য সর্বোত্তম নির্ভরযোগ্য ডাক্তারি পরীক্ষা পদ্ধতি। আল্ট্রাসনোগ্রাফির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্যান্য রেডিওলোজিকাল পরীক্ষার তুলনায় কম বলে এটা বেশ নিরাপদ।
- **রোগ নির্ণয়:** আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- লিভার, স্প্লিন বা প্লিহা, কিডনি, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী, পিত্তথলি, চক্ষু, থাইরয়েড, মূত্রথলীসহ নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের নানাবিধ রোগ সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব।
- **বায়োপসি ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে:** বায়োপসি ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি ব্যবহার করা যায়। যেমন- শরীরের কোন অঙ্গের পাথর নিরাময়ের জন্যও আল্ট্রাসনোগ্রাফি বহুল ব্যবহৃত হয়।
- **রক্তনালীর গতিপথ ও প্রবাহ নির্ণয়:** বর্তমানে আল্ট্রাসনোগ্রাফির আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হল রক্তনালীর গতিপথ ও প্রবাহ নির্ণয় করা। এতে করে আমাদের রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার রোগও ডায়াগনোসিস করা সম্ভব।
- **ইকোকার্ডিওগ্রাম:** হৃৎপিণ্ডের গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য যে ইকো করা হয় তা মূলত আল্ট্রাসনোগ্রাফিরই অন্য আরেকটি ব্যবহার।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি

➢ রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফির গুরুত্ব:

✓ স্নায়ুর অতি কাছে যখন ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যানেসথেসিয়া বা অবচেতনকারী প্রয়োগ করা হয় তখন গাইড হিসেবে অনেক সময় আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়।

✓ হৃদরোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। বহুল প্রচলিত ইকোকার্ডিওগ্রাম আসলে আল্ট্রাসনোগ্রাম। কালার ডপলারের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ ও হার্টের টিস্যুর অবস্থা অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝা সম্ভব। এর মাধ্যমে হার্টের ভাল্ভ কতখানি কর্মক্ষম আছে, কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি না, ভালভুলার রিগারজিটেশন আছে কি না, হার্ট ঠিকমতো রক্ত পাম্প করতে পারছে কি না ইত্যাদিও জানা যায়। আবার রক্তনালি ব্লকড বা সরু হলে আর্টারিয়াল আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। ভেনাস আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস পর্যালোচনা করা যায়।

✓ ইমার্জেন্সি মেডিসিনে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার এখন খুব বেড়েছে, যার মাধ্যমে দ্রুত আঘাতের পরিমাণ ও বিস্তৃতি, পেরিকার্ডিয়াল টেমপোনেড, হেমোপেরিটোনিয়ামের মতো জরুরি অবস্থা নির্ণয় করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া যায়। আর গলব্লাডার বা অ্যাপেন্ডিক্সের মতো হঠাৎ ব্যথা হয় এমন অসুখও নির্ণয়ে ইমার্জেন্সিতে আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে হয়।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি

- ✓ পরিপাকতন্ত্র বা পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম বহু কারণেই করতে হয়। মূলত পেটের আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমেই কিডনি, লিভার, স্প্লিন, গলব্লাডার, প্যানক্রিয়াজ বা অগ্ন্যাশয়, পেটের টিউমার ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়।
- ✓ নবজাতকের মাথার ওপরের দিকের নরম অংশ স্ক্যান করে তার মস্তিষ্কে কোনো গঠনগত অসংগতি, হাইড্রোক্যাফালাস, পেরিভেন্ট্রিকুলার লিউকোম্যালাসিয়া ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। পরে এ নরম অংশ ক্রমেই শক্ত হাড়ে পরিণত হয়ে গেলে আর আল্ট্রাসনোগ্রাম করে মস্তিষ্ক পরীক্ষা করা যায় না।
- ✓ প্রসূতিবিদ্যায় বহু ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়। এমনকি গর্ভধারণের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়ও অনেক সময়ই গর্ভধারণ নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা হিসেবেও এটি করা হয়। জন্মানোর আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখা হয় অনাগত শিশুর সুস্থতাও। ডপলার সনোগ্রাফির মাধ্যমে শিশুর হৃদস্পন্দন বোঝা যায়। এতে শিশুর জন্মগত কোনো হার্টের অসুখ থাকলে তা আগে থেকেই জানা যায়।
- ✓ ইউরোলজির বহু রোগ নির্ণয় সহজ হয়েছে আল্ট্রাসনোগ্রামের ব্যবহারের কারণে। যেমন- প্রস্রাবের পর কতখানি প্রস্রাব থলিতে আটকে আছে, তা জানতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা এটি। আবার প্রজননতন্ত্র, বিশেষ করে জরায়ু ও শুক্রথলির রোগ নির্ণয়েও আল্ট্রাসনোগ্রাম জরুরি। টেস্টিকুলার ক্যান্সার, হাইড্রোসিলি বা ভেরিকোসিলির পার্থক্য বুঝতেও এ পরীক্ষা কাজে লাগে।
- ✓ হাড়ের আল্ট্রাসনোগ্রাম ভালো হয় না; কিন্তু হাড়ের আবরণী, লিগামেন্ট, স্নায়ু, মাংসপেশি ও টেন্ডন আল্ট্রাসনোগ্রাম করে এগুলোর অসুখ নির্ণয় করা যায়।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি

❑ আল্ট্রাসনোগ্রাফির অপকারিতা

যুগের উন্নতির সাথে সাথে টেকনোলজি অনেক অগ্রসরমান হওয়ায় আল্ট্রাসনোগ্রাফির জগতেও অনেক উদ্ভাবন ঘটেছে। এখন খুব সহজেই 4D ব্যবহার করে বাচ্চার মুখাবয়ব পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টেকনোলজির ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। তাই বাচ্চা ও মা সুস্থ থাকলে শুধুমাত্র ফ্যান্টাসি বা বিনোদন হিসেবে 4D ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে 4D তে অনেক বেশি উচ্চ কম্পাংকের শব্দ তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, যাতে মায়ের পেটের ভিতরে অবস্থানরত বাচ্চার অতি সংবেদনশীল টিস্যুর ক্ষতিসাধন হতে পারে। তাই গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাফির সময় এ ব্যাপারে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই সচেতন থাকা জরুরি।

❑ সিটিস্ক্যান (CT Scan = Computed Tomography Scan)

➢ সিটিস্ক্যান করার কারণ:

- ✓ ক্যান্সার বা টিউমার নির্ণয়।
- ✓ মস্তিষ্কের রোগ বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা নির্ণয়।
- ✓ হৃদযন্ত্রের কোনো রোগ বা রক্ত প্রবাহে কোনো বাধা রয়েছে কিনা জানতে।
- ✓ ফুসফুসের রোগ নির্ণয়।
- ✓ হাড় ভাঙ্গা বা অন্য কোনো সমস্যা নির্ণয়।
- ✓ কিডনী বা মূত্রসংবহন তন্ত্রের কোন রোগ বা পাথর শনাক্তকরণ।
- ✓ পিত্তথলি, লিভার বা অগ্নাশয়ের রোগ নির্ণয়।
- ✓ বায়োপসি করার ক্ষেত্রে গাইড হিসেবে সিটি স্ক্যানের সাহায্য নেয়া হতে পারে।
- ✓ ক্যান্সার রোগীর ক্যান্সারের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে সিটি স্ক্যান করা হয়।
- ✓ এছাড়া যেসব রোগীকে পেস মেকার, ভাল্ভ বা এ জাতীয় যন্ত্র দেয়া হয়েছে তাদের এমআরআই করা যায় না, এ কারণে সিটি স্ক্যান করতে হয়।

❑ এম.আর.আই (M.R.I = Magnetic Resonance Imaging)

➢ কার্যপদ্ধতি

- ✓ মানবদেহের শতকরা ৭০% ভাগই পানি আর চর্বি। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন পরমাণু। সাধারণত এই পরমাণুগুলো লাটিমের মতো তাদের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে এদিক ওদিক ইতস্ততভাবে ঘুরতে থাকে।
- ✓ যদি মানবদেহকে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয় তবে এই হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ জোড়ায় জোড়ায় এমনভাবে সজ্জিত হয় যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পরমাণু চৌম্বকক্ষেত্রের উত্তর মেরুর দিকে এবং বাকী প্রায় অর্ধেক সংখ্যক চৌম্বকক্ষেত্রের দক্ষিণ মেরুর দিকে সজ্জিত হয়ে যায়।
- ✓ কিন্তু কিছু হাইড্রোজেন পরমাণু বিজোড় থেকে যায়। এমতাবস্থায় যদি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ (বেতার কম্পাঙ্কের তরঙ্গ) পালস্ পাঠানো হয় তবে এই বিজোড় পরমাণুগুলো শক্তি গ্রহণ করে বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে অপর দিকে ঘুরে যায়।
- ✓ অতঃপর যদি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস্ বন্ধ করে দেয়া হয় তবে এই পরমাণুগুলো আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে এবং শক্তি নিঃসরণ করে। এই শক্তি কম্পিউটারে সংকেত পাঠায় এবং কম্পিউটার গাণিতিক সূত্র এবং অ্যালগরিদমের সাহায্যে তা দিয়ে সুন্দর চিত্র গঠন করে।
- ✓ এম.আর.আই মেশিনে যে রেডিও পালস পাঠানো হয় তার কম্পাঙ্ক থাকে সাধারণত হাইড্রোজেনের নিজস্ব কম্পাঙ্কের সমান। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুতে অনুরণন (Resonance) সৃষ্টি হয়। এ কারণেই একে রেজোনেন্স ইমেজিং বলা হয়।

CT SCAN & MRI

➢ **সাধারণভাবে এম.আর.আই পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত রোগ নির্ণয় করা যায়:**

- ✓ মস্তিষ্কের রোগ, যেমন টিউমার, স্ট্রোক এবং অন্যান্য।
- ✓ মহিলাদের স্তন ও তল পেটের সমস্যা।
- ✓ মেরুদণ্ডের রোগ/আঘাত।
- ✓ প্রস্টেট সমস্যা।
- ✓ জোড়া রোগ ও ক্রীড়াজনিত আঘাত।
- ✓ লিভার, পিত্ত নালী ও কিছু আন্ত্রিক রোগ।
- ✓ হাড় ও মাংসপেশির সমস্যা।
- ✓ নাক, কান ও গলার (ইএনটি) নির্দিষ্ট রোগ, ইত্যাদি।
- ✓ রক্তনালীর অস্বাভাবিকতা।

সিটি স্ক্যান ও MRI

CT
Uses radiation
Donut shape
Typically lasts 5 min
Good for seeing organs & bony detail
MRI
No radiation
Tanning bed shape
Can last 30 min or more
Good for seeing soft tissue

ENDOSCOPY & ECG

❑ এন্ডোসকপি

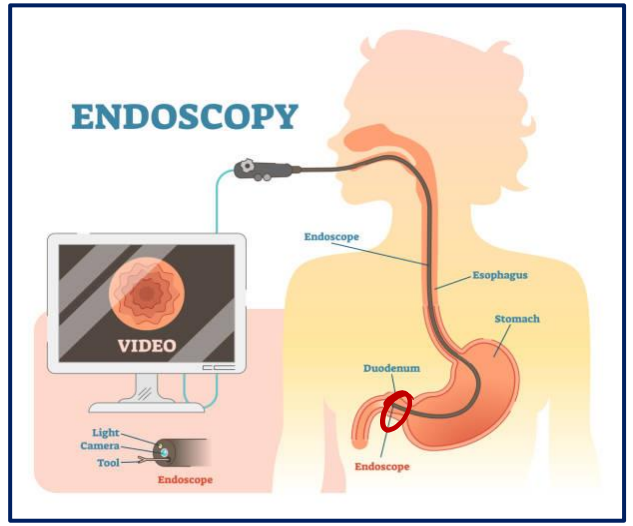

➢ **এন্ডোসকপি করার কারণ:** যেসব কারণে এন্ডোসকপি করা হয় সেগুলো হলো-

- ✓ পেটব্যথা
- ✓ আলসার
- ✓ গিলতে অসুবিধা
- ✓ খাদ্যনালীতে রক্তপাত
- ✓ পেটের অভ্যাসে পরিবর্তন আসা ইত্যাদি।

ENDOSCOPY & ECG

➢ এন্ডোসকপি করার প্রস্তুতি:

✓ ৮-১০ ঘণ্টা খালি পেটে থাকতে হবে।

✓ ঢোলা কাপড় পড়ে আসতে হয় ইত্যাদি।

✓ টেস্ট করার সময় চেতনানাশক স্প্রে বা ঔষধ খাওয়ানো হয়। তবে কোন ঔষধে এলার্জি থাকলে ডাক্তারকে আগেই জানিয়ে দিতে হবে।

➢ এন্ডোসকপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

✓ বমি বমি ভাব হতে পারে।

✓ পেটে অল্প সময়ের জন্য ব্যথা হতে পারে।

✓ ঘুম ঘুম লাগতে পারে।

✓ অল্প ব্লিডিং হতে পারে।

✓ মাইনর ইনফেকশন হতে পারে ইত্যাদি।

ENDOSCOPY & ECG

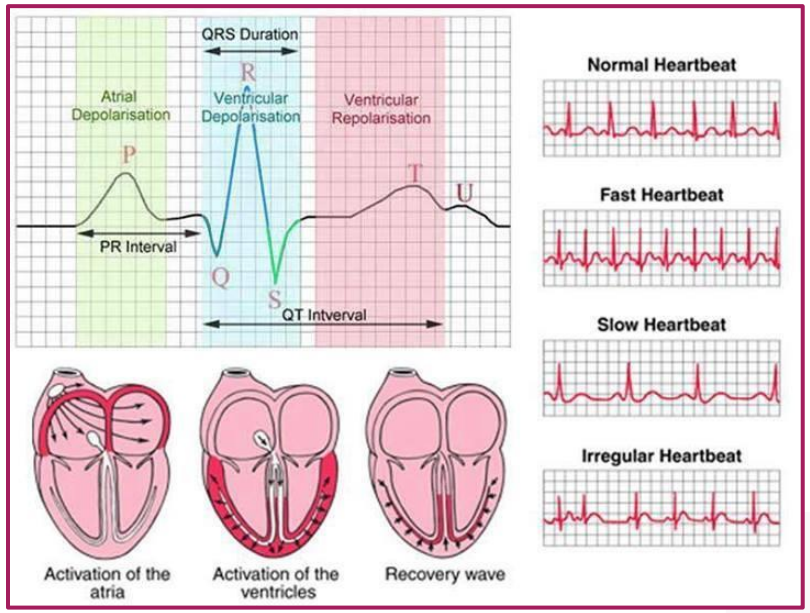

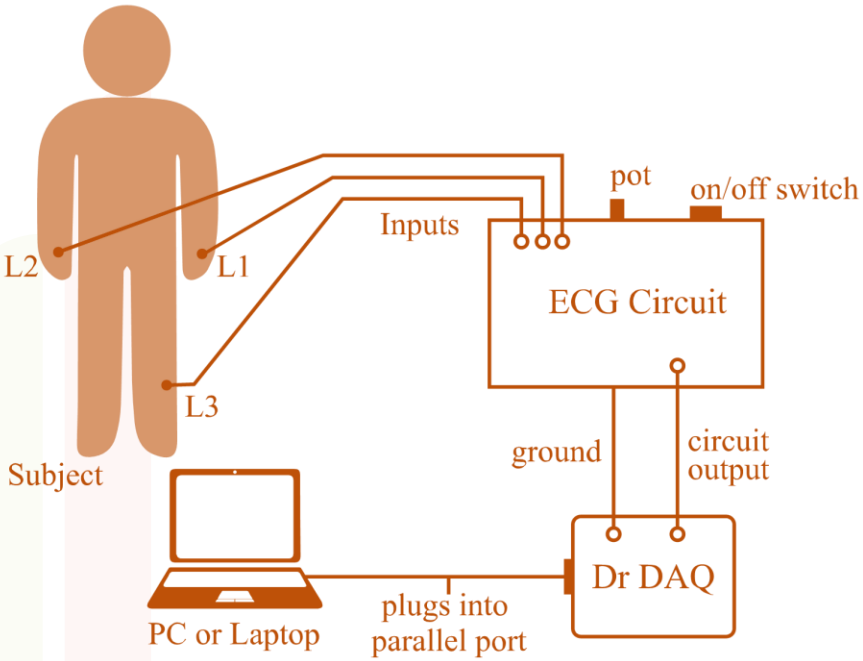

❑ ECG এর কারণ:

- ✓ হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন বা স্পন্দনের হার কম বেশি হলে।
- ✓ হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকলে।
- ✓ হৃৎপিণ্ডের আকার বড় হয়ে থাকলে ইত্যাদি।

ক্যান্সার

❑ ক্যান্সার

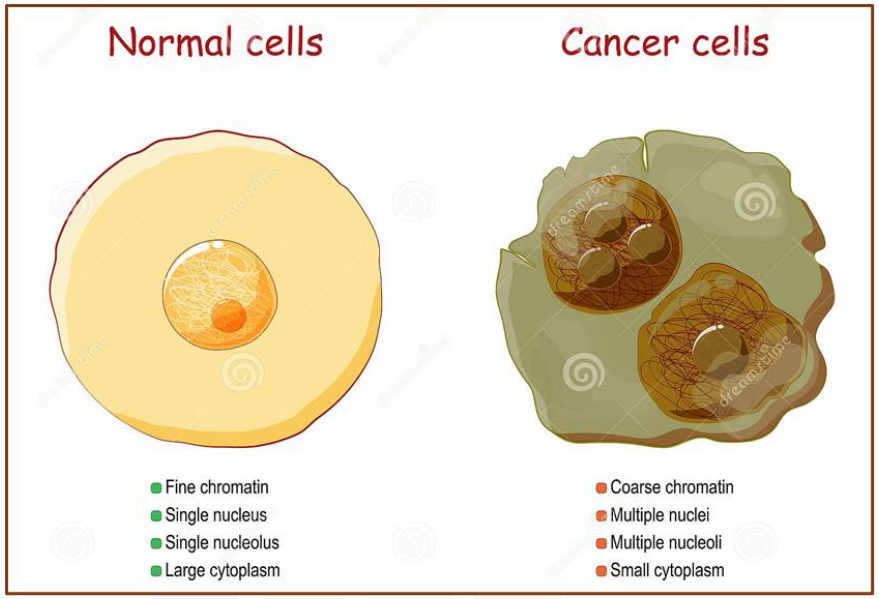

➢ **ক্যান্সারের কারণ:** ক্যান্সার সংক্রামক ব্যাধি নয়। এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি কেন এই স্বাভাবিক কোষ অস্বাভাবিক কোষে পরিণত হয়। ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান, 'হরমোন' তেজস্ক্রিয়তা, পেশা, অভ্যাস (ধূমপান, তামাক সেবন, মদ্যপান ইত্যাদি), আঘাত, প্রজনন ও বিকৃত যৌন আচরণ, বায়ু ও পানি দূষণ, খাদ্য (যেমন- অত্যধিক চর্বি বা অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য), বিভিন্ন বর্ণগত, জীবন যাপন পদ্ধতিগত, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রভাব, প্যারাসাইট ও ভাইরাস সাধারণত সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ এবং এর প্রায় ৯০ শতাংশই এড়িয়ে চলা সম্ভব।

ক্যান্সার

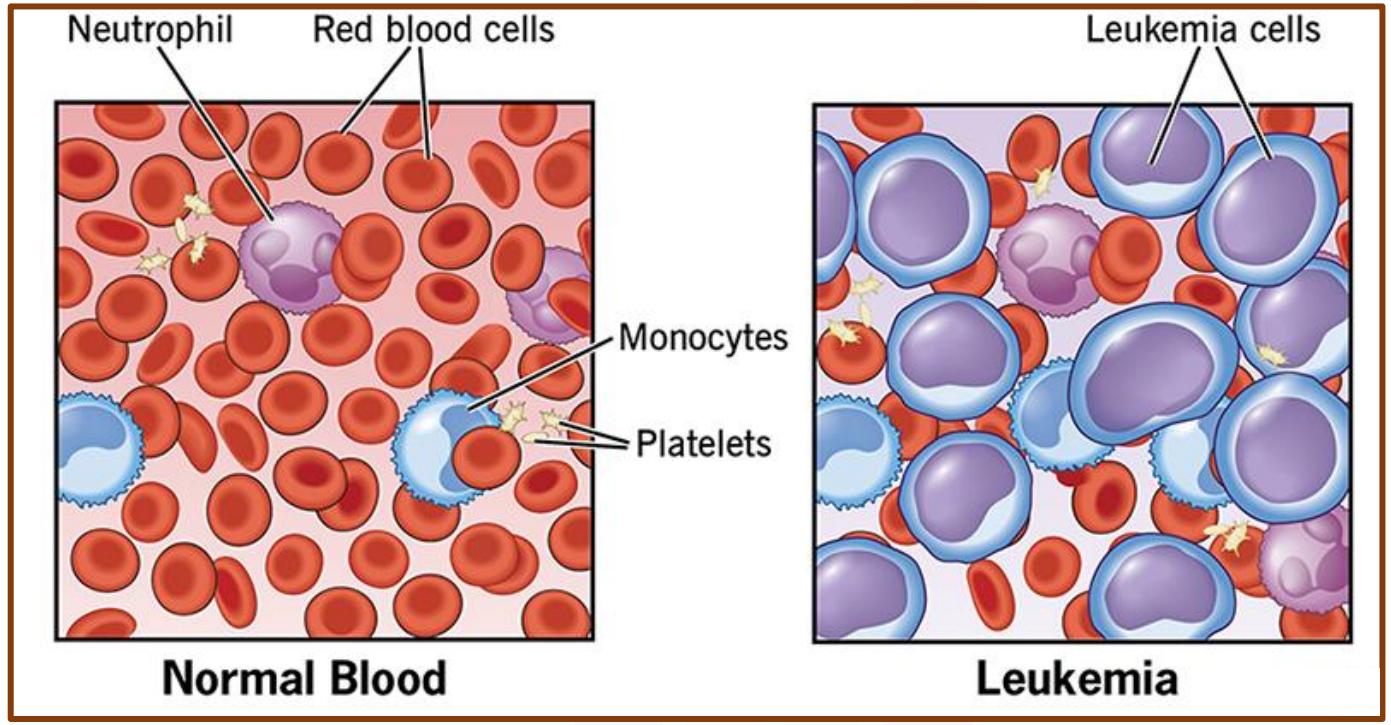
Neutrophil
Red blood cells
Monocytes
Platelets
Normal Blood
Leukemia cells
Leukemia

ক্যান্সার

❖ **ক্যান্সারের চিকিৎসা পদ্ধতি:** সাধারণত ক্যান্সার তিনটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই সাথে একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

➢ **সার্জারি বা শল্য চিকিৎসা:** প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার আক্রান্ত স্থানকে অপারেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে কেটে বাদ দিয়ে শরীর ক্যান্সারমুক্ত করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ক্যান্সার নিরাময়ের সম্ভাবনা সর্বাধিক।

➢ **রেডিওথেরাপি বা বিকিরণ চিকিৎসা:** বেশির ভাগ ক্যান্সার রোগীর ক্ষেত্রে সার্জারি কিংবা অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি অথবা এককভাবে রেডিওথেরাপির সাহায্যে শরীরের ভেতরেই ক্যান্সার কোষগুলো ধ্বংস করে ফেলা যায়।

➢ **কোমোথেরাপি:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্জারি এবং রেডিওথেরাপির পাশাপাশি অথবা আগে বা পরে ক্যান্সার কোষ ধ্বংসকারী ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বস্তুত রোগ এবং রোগীর অবস্থাভেদে সার্জারি, রেডিওথেরাপি ও কোমোথেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়। তবে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের সম্ভাবনা বেশি।

ক্যান্সার

❑ রেডিওথেরাপি

- ✓ ক্যান্সারের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে।
- ✓ ক্যান্সারজনিত লক্ষণগুলিকে দূর করতে।
- ✓ সার্জারির পরে, অবশিষ্ট ক্যান্সার কোষগুলির বৃদ্ধি বন্ধ করতে।
- ✓ অস্ত্রোপচারের আগে, ক্যান্সারযুক্ত টিউমারগুলিকে কমাতে।
- ✓ ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করার জন্য অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে- যেমন: কেমোথেরাপির সাথে ব্যবহার করা হয়।

ক্যান্সার

- **পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** অনেক সময় রেডিওথেরাপির উচ্চমাত্রার বিকিরণের ফলে ক্যান্সার কোষের আশেপাশে থাকা কিছু সুস্থ কোষও নষ্ট হয়ে যায়। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মাথা, ঘাড় ও বুকে রেডিওথেরাপি প্রয়োগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে চুল পড়ে যাওয়া, ক্লান্তি ও অবসাদ, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হতে পারে। আবার পরিপাক ও জনন তন্ত্রের দিকে রেডিওথেরাপি প্রয়োগে বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, চুল পড়ে যাওয়া, যৌনক্ষমতা জনিত সমস্যা ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

- **প্রোটন বিম থেরাপি:** বর্তমানে X-ray এর পরিবর্তে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পজেটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন কণা বিচ্ছুরণ ব্যবহার করেও রেডিওথেরাপি দেয়া হয়।

- **ইন্টারনাল রেডিও থেরাপি:** ইন্টারনাল রেডিও থেরাপিতে শস্যদানার আকৃতিবিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল ক্যান্সার আক্রান্ত অংশের কাছাকাছি সার্জারির মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। প্রতিনিয়ত এই ক্যাপসুল থেকে বিকিরণ নির্গত হয়ে ক্যান্সার কোষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

উপরিউক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো বর্তমানে ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রচলিত পদ্ধতি। আধুনিক অণুপ্রাণ বিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞান, জেনেটিক্স, ন্যানোটেকনোলজির অগ্রগতির ফলে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে নতুন ধরনের আশার আলো দেখছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ।

ক্যান্সার

❑ কেমোথেরাপি

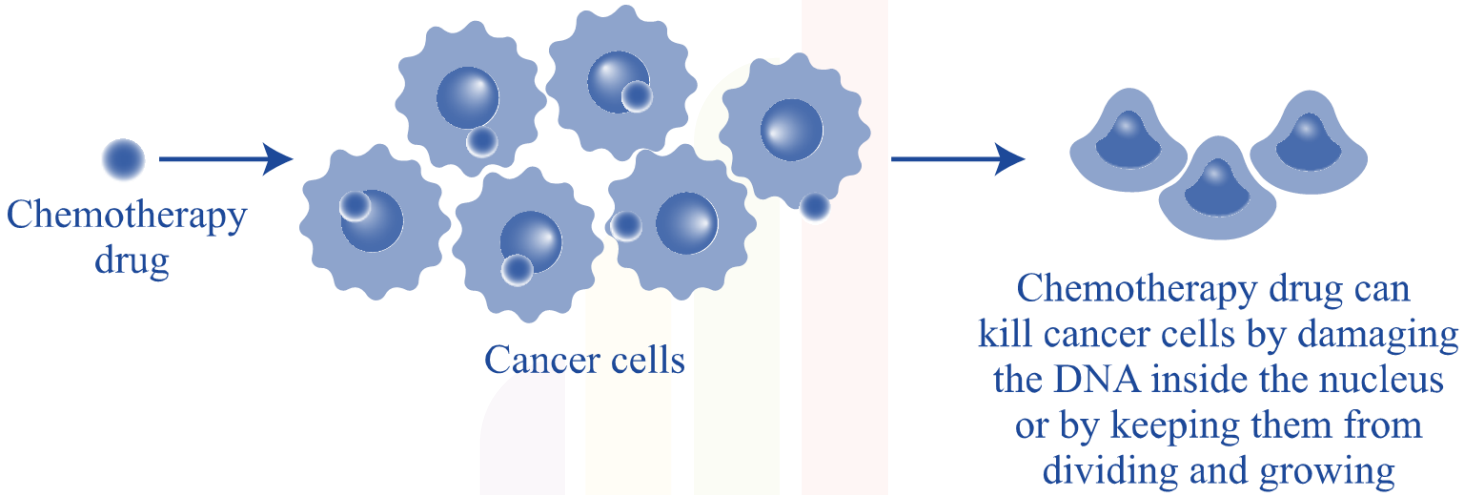

কেমোথেরাপির প্রয়োগ পদ্ধতি:

রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য এবং রোগের তীব্রতার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন উপায়ে কেমোথেরাপি দেয়া যেতে পারে। এগুলো হলো-

- **ইনজেকশন:** এই প্রক্রিয়ায় ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রবিষ্ট করা হয়।
- **ওরাল:** ঔষধ বড়ি বা ক্যাপসুল হিসেবে।
- **টপিকাল:** ক্রিম হিসেবে ত্বকে মালিশ করে।

ক্যান্সার

➢ কেমোথেরাপির প্রধান লক্ষ্যগুলো হচ্ছে:

✓ ক্যান্সার পুরোপুরি ধ্বংস করা (সর্বোত্তম ফলাফল)।
✓ ক্যান্সার ছড়ানো ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা।
✓ প্যালিয়েশন বা রোগের উপসর্গ বা ব্যথা প্রশমিত করা।

ক্যান্সারের ধরন, রোগীর মেডিকেল ইতিহাস, শারীরিক স্থানের প্রকৃতি, শারীরিক ওজন, বয়স ও ক্যান্সারের পর্যায়ের ওপর কেমোথেরাপির ডোজ, শিডিউল ও ওষুধ নির্ভর করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতবার কেমোথেরাপি দিতে হবে রোগীভেদে তা ভিন্ন হতে পারে।

➢ কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

✓ কেশগ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
✓ প্রজননতন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
✓ মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।
✓ বমি বমি ভাবের উদ্রেক ঘটে।
✓ ত্বক এবং নখ শুকিয়ে আসে।
✓ ঘন ঘন মন মেজাজের পরিবর্তন ঘটে।

এনজিওগ্রাফি

➤ এনজিওগ্রাফি (Angiography)

এনজিওগ্রাফি কোনো অঙ্গে রক্তের প্রবাহকে নিরীক্ষণের জন্য করা হয়। ধমনিগুলো স্বাস্থ্যকর আছে কিনা এবং এর মধ্য দিয়ে কিভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা জানার জন্য এটি করা হয়। এটি রক্ত প্রবাহী ধমনিগুলোর অবস্থা নিরূপণে সাহায্য করে। অনেকক্ষেত্রে এনজিওগ্রাফি করার দরকার হয় যার মধ্যে নিচে কিছু উল্লেখ করা হলো-

- ✓ যে ব্যক্তির অ্যানজিনা আছে - যদি একজন ব্যক্তি বুকে অস্বাভাবিক ব্যথা বা চাপ অনুভব করেন, যেটা কাঁধে, হাতে, গলায়, চোয়ালে অথবা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে এনজিওগ্রাফি করতে বলা হয়।
- ✓ যে ব্যক্তির কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে - যদি কোনো ব্যক্তির হৃদস্পন্দন হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পরিস্থিতি বোঝার জন্যে এনজিওগ্রাফি করা হতে পারে।
- ✓ যদি ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম, এক্সারসাইজ স্ট্রেস টেস্ট এবং অন্য পরীক্ষাতে দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তির হৃদরোগ আছে, তাহলে অবশ্যই এনজিওগ্রাফি করতে হবে।
- ✓ যদি একজন ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হন, জরুরি ভিত্তিতে করোনারি এনজিওগ্রাফি করা হয়।

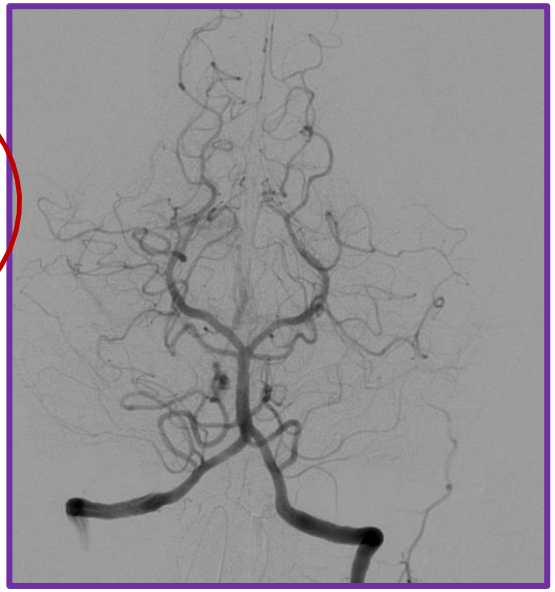

AIDS

❑ এইডস (AIDS)

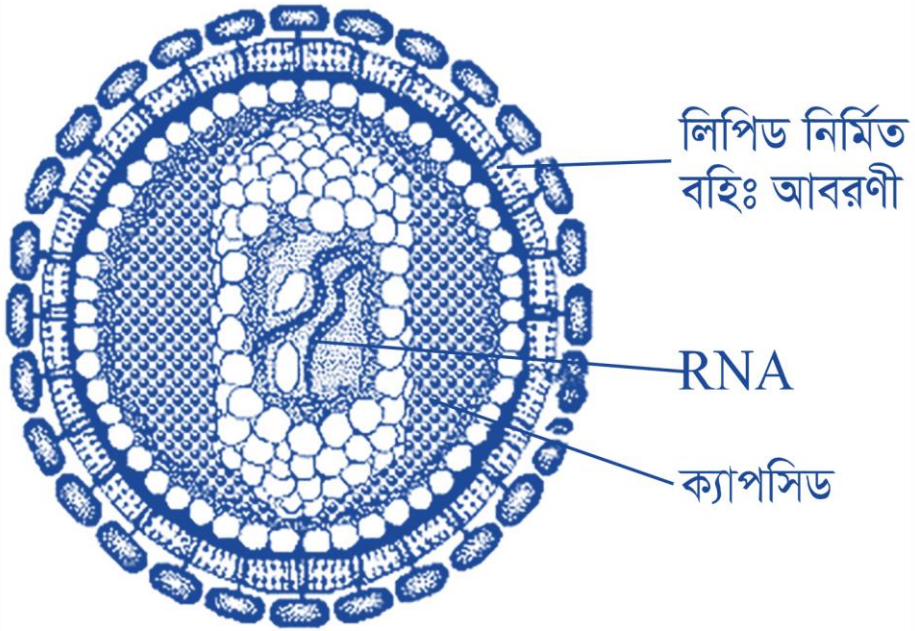

AIDS

❑ HIV যেভাবে ছড়ায়:

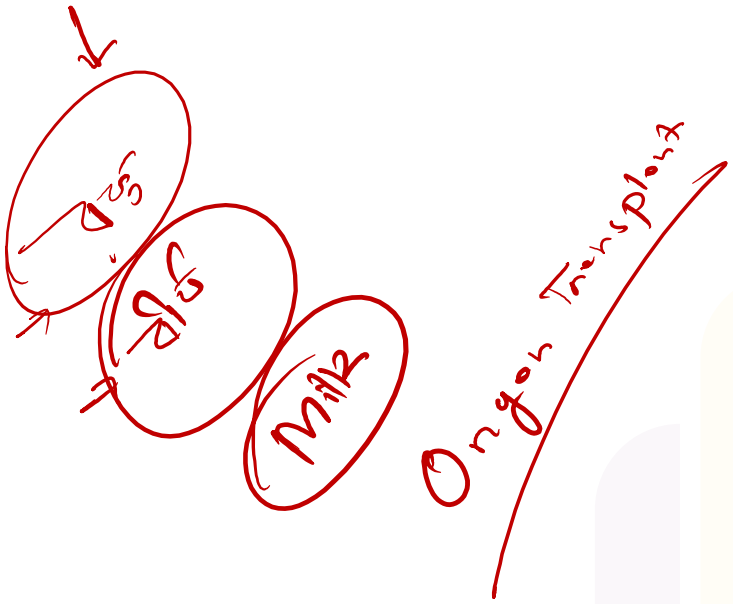

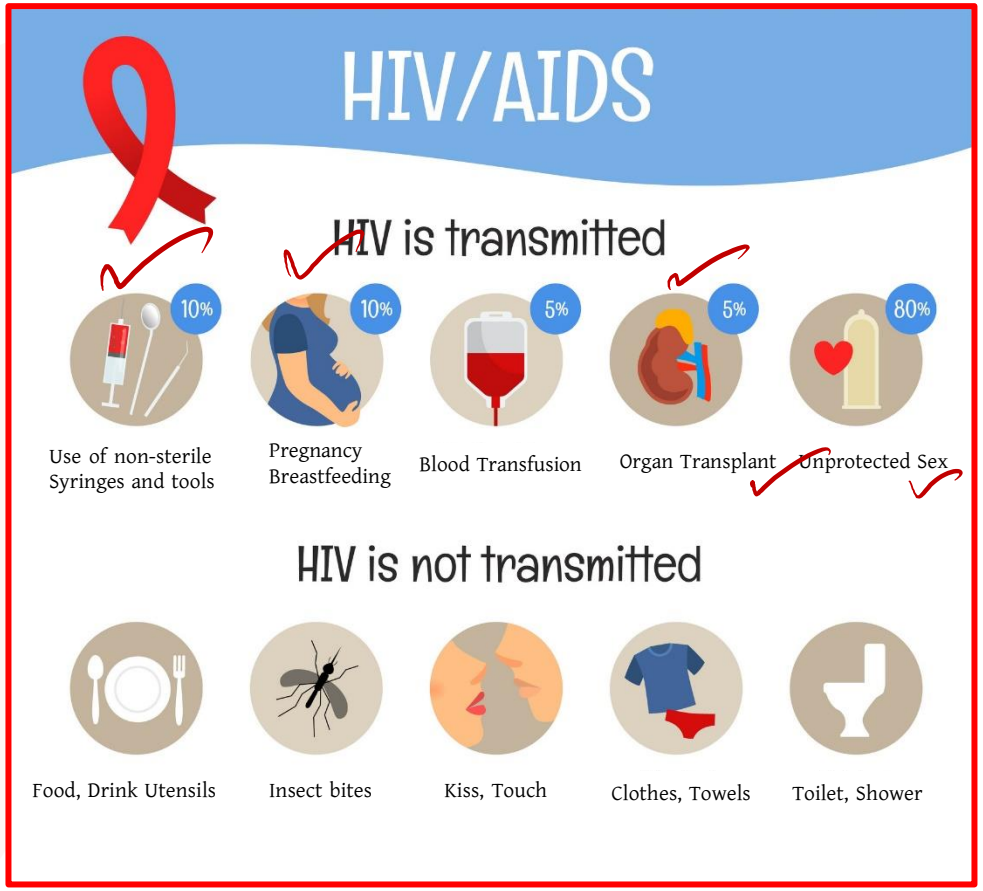

AIDS

➢ এইডস প্রতিরোধে করণীয়:

- ✓ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এইডস প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা।
- ✓ শরীরে রক্ত বা কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের প্রয়োজন হলে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে, সে রক্ত বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এইচআইভি নেই।
- ✓ একবার ব্যবহার করা যায় এমন জীবাণুমুক্ত সূঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সূঁচ, সিরিঞ্জ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে নিশ্চিতভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- ✓ দেখা গেছে, যৌনরোগ বা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ থাকলে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই কারও যৌনরোগ বা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে।
- ✓ জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রতিরোধমূলক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

এইডসের কোনো প্রতিষেধক বা টিকা আবিষ্কার হয়নি। এর যে চিকিৎসা বের হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া এ চিকিৎসা শুধু এইডস আক্রান্তের সময়কে বিলম্বিত করে, এইডস পুরোপুরি নিরাময় করে না।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

সংজ্ঞা	• ভাইরাল হেপাটাইটিস হলো ভাইরাসঘটিত লিভারের প্রদাহজনিত রোগ।
বিশেষ তথ্য	• অধিকাংশ হেপাটাইটিস-ই HBV এর আক্রমণ ঘটে থাকে। • HCV-কে তুষের আগুন/নীরব ঘাতক বলে। • লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস B ও C ভাইরাসের সংক্রমণে হয়

বৈশিষ্ট্য	HAV	HBV	HCV	HDV	HEV
ভাইরাস গ্রুপ	এন্টারো ভাইরাস	হেপাডিএনএ ভাইরাস	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	অসম্পূর্ণ ভাইরাস	ক্যালিসি ভাইরাস
নিউক্লিক অ্যাসিড	RNA	DNA	RNA	RNA	RNA

ভাইরাল হেপাটাইটিস

❑ হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস বলতে যকৃতের প্রদাহ (ফুলে যাওয়া) বোঝায়। ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ বা অ্যালকোহলের মতো ক্ষতিকারক পদার্থের কারণে ঘটা যকৃতের একটি রোগ। হেপাটাইটিস অল্প কিছু উপসর্গসহ বা কোনো উপসর্গ ছাড়াই ঘটতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্ডিস, এনরেক্সিয়া (ক্ষুধমান্দ্য) ও অসুস্থতাবোধ এর লক্ষণ বা উপসর্গ। হেপাটাইটিসের ৫ টি ভাইরাস হল এ, বি, সি, ডি এবং ই। এর মধ্যে টাইপ-বি এবং সি মারাত্মক রূপ নেয় এবং লিভার সিরোসিস এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক আকার ধারণ করে।

এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ ও জটিলতা তৈরি করে কেবল হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস। বিশ্বে হেপাটাইটিস বি অথবা সি আক্রান্ত প্রায় ৯০ শতাংশ লোকই জানে না যে তারা এ ভাইরাস বহন করে চলেছে। ফলে না জেনেই তারা ভাইরাসটি ছড়াতে থাকে। বাংলাদেশেও প্রায় এক কোটি মানুষ বি অথবা সি ভাইরাসে আক্রান্ত।

- **হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ:** রোগের বিস্তার না ঘটা পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণ স্পষ্ট হয় না। হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হলে শরীর দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, পেটব্যথা, শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করা এবং হলুদ প্রস্রাবের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে রোগের বিস্তার ঘটলে পেটে পানি আসা, রক্ত পায়খানা ও রক্তবমি হতে পারে। এমনকি রোগী চেতনাও হারাতে পারে।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

- **যেভাবে ছড়ায়:** হেপাটাইটিস এ এবং ই ভাইরাস খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়। এগুলোর সংক্রমণে যে জন্ডিস হয়, তা সাধারণত সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। কিন্তু হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস অনিরাপদ যৌনসংস্পর্শ, অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ, ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ, একাধিক ব্যক্তির একই ব্লেড-কাঁচি ব্যবহার, অনিরাপদ দাঁতের চিকিৎসা বা বিভিন্ন অনিরাপদ অস্ত্রোপচার এবং সন্তান জন্মদানের সময় আক্রান্ত মা থেকে শিশুতে সংক্রমণ হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রক্তের নানা ধরনের অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ শনাক্ত করা যায়।

- **চিকিৎসা:** এ এবং ই ভাইরাস সংক্রমণজনিত হেপাটাইটিস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আপনা-আপনি ভালো হয়ে যায়। অল্প কিছু ক্ষেত্রে শুধু বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। বি ভাইরাস নির্মূল করা না গেলেও চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সি ভাইরাসও চিকিৎসার মাধ্যমে নির্মূল করা যায়। অনেকের ধারণা, হেপাটাইটিস বি বা সি সংক্রমণ হলে আর কোনো আশা নেই, লিভার বা যকৃত নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে এ দুটো ভাইরাস নির্মূলের জন্য আধুনিক অ্যান্টি-ভাইরাল থেরাপি রয়েছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসকের পরামর্শে, প্রয়োজনে জীবনব্যাপী গ্রহণ করে যেতে হবে। এ ছাড়া হেপাটাইটিস এ ও বি-এর প্রতিষেধক টিকা আছে, যার মাধ্যমে এসব ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব। সঠিক সময়ে প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা না করালে হেপাটাইটিস থেকে যকৃত অকার্যকর হয়ে পড়া বা লিভার ফেইলিউর, লিভার সিরোসিস বা ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে ।

VACCINATION

❑ ভ্যাক্সিন বা টিকা

রোগের নাম	টিকার নাম
যক্ষ্মা	বিসিজি
পোলিও-মাইলিটিজ	ওপিভি
১. ডিপথেরিয়া ২. হুপিং কাশি ৩. ধনুষ্টংকার ৪. হিমোফাইলাস বি ইনফ্লুয়েঞ্জা ৫. হেপাটাইটিস বি	পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা
নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া	পিসিভি
হাম ও রুবেলা	এম আর ভ্যাকসিন
ধনুষ্টংকার	টিটি

রাতকানা

রাতকানা (Night Blindness) বলতে রাতে স্বল্প আলোয় দেখার অক্ষমতা। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রোগের নাম নিকটালোপিয়া (Nyctalopia)। ভিটামিন-'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। চোখের রেটিনার রডকোষ স্বল্প আলোতে দেখার জন্য কার্যকর। ভিটামিন-'এ' এর অভাবে এগুলোর অন্ধকারের সাথে চোখের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরিণামে রাতের কম আলোতে রোগী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। রোগীর এ অবস্থাকে রাতকানা রোগ বলে।

❑ রাতকানা রোগের কারণ:

- ✓ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত ও পরিমাণমতো না খাওয়া।
- ✓ হাম, ডায়রিয়া, অপুষ্টিজনিত অথবা অন্য কোনো কারণে শরীরে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব।
- ✓ 'রেটিনিটিস পিগমেন্টোসা' হলো একটি জন্মগত রাতকানা রোগ যা জিনগত ত্রুটির কারণে হয় (ভিটামিনের অভাবে নয়)।
- ✓ বাড়ন্ত বয়সে অতিরিক্ত খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে না পারলে এই রোগ হতে পারে।
- ✓ অনেক সময় দেখা গিয়েছে রাতকানা রোগটি বংশগতভাবে হয়ে এসেছে। তবে, এটি ছোঁয়াচে না। চোখে ছানি পড়ার কারণে এ রোগটি হতে পারে।
- ✓ দৃষ্টি ক্ষীণতা বা মাইয়োপিয়া রোগের চিকিৎসা না করা হলে রাতকানা রোগ হতে পারে।
- ✓ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি রোগের কারণে রাতকানা রোগ হওয়া সম্ভব।
- ✓ গ্লাইকোমিয়া ওষুধ গ্রহণ করলে রাতকানা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- ✓ ভিটামিন-'এ' এবং জিঙ্কের অভাব একটি বড় কারণ হতে পারে রাতকানা রোগের।

রাতকানা

❑ রাতকানা রোগ প্রতিকারে পদক্ষেপ:

- ✓ ভিটামিন-'এ' জাতীয় খাবার, যেমন: টাটকা শাকসবজি, গাজর, টমেটো, ছোট মাছ খাওয়া;
- ✓ ভিটামিন-'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো;
- ✓ মাছের মাথা, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি খাওয়ানো এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

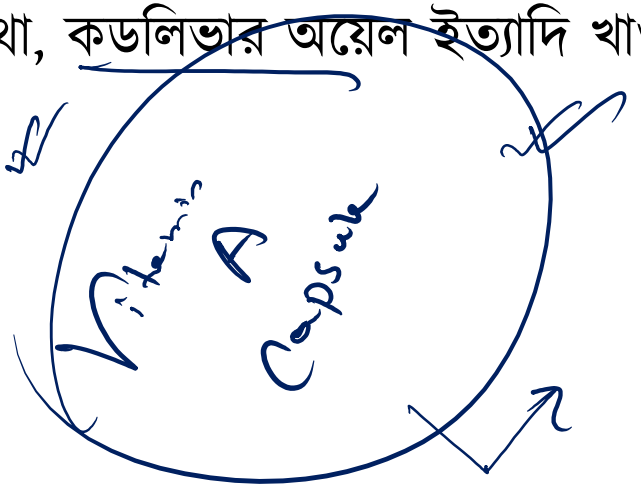

যক্ষ্মা

❑ যক্ষ্মা

- যক্ষ্মা একটি সংক্রামক ব্যাধি।
- যা প্রধানত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। তবে ফুসফুস ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন স্থানে যক্ষ্মা হতে পারে। যেমন- লসিকাগ্রন্থি, হার ও গিট, অন্ত্র, হৃৎপিণ্ডের আবরণ ও মস্তিস্কের আবরণ ইত্যাদি।
- মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস (Mycobacterium tuberculosis) নামক ব্যাক্টেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী।

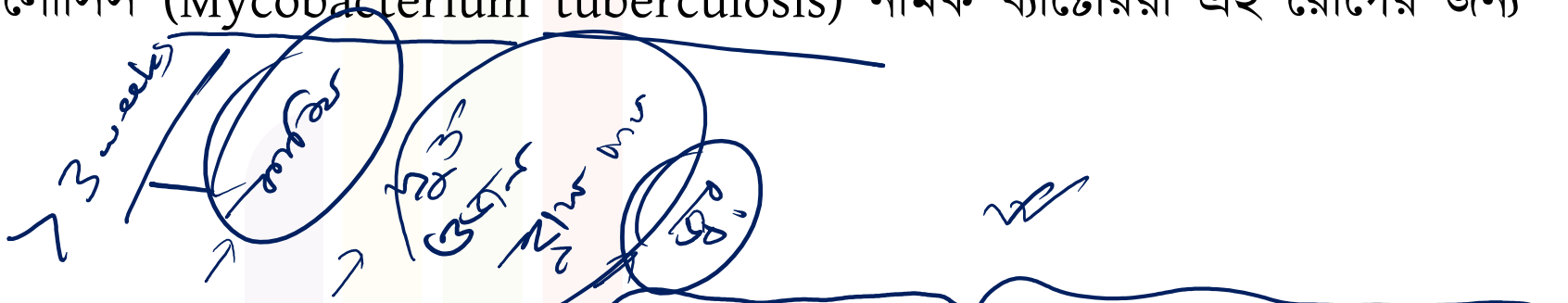

❑ **লক্ষণ:** সাধারণত সন্ধ্যা বেলায় জ্বর আসে। খাবার খাওয়া সত্ত্বেও শরীর শুকিয়ে যায়। ৩ সপ্তাহের অধিক কফ হয়। সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক খেলেও সারে না। একটা সময় দেখা যায় যে কফের সঙ্গে রক্ত আসছে। অনেক ক্ষেত্রে রক্ত নাও আসতে পারে। ওজন কমে যায়। ক্ষুধামান্দ্য হয়ে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। সাধারণত ফুসফুসের যক্ষ্মায় এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্য কোন যক্ষ্মার ক্ষেত্রে লক্ষণ নাও থাকতে পারে।

যক্ষ্মা

❑ যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধের উপায়:

- ✓ জন্মের পর পর প্রত্যেক শিশুকে বিসিজি টিকা দিতে হবে।
- ✓ পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- ✓ বাসস্থানের পরিবেশ খোলামেলা, আলো-বাতাস সম্পন্ন হতে হবে।
- ✓ জনাকীর্ণ পরিবেশে বসবাস যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
- ✓ ডায়াবেটিস জাতীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী রোগের ক্ষেত্রে, সুষ্ঠু চিকিৎসা নিতে হবে।
- ✓ যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীকে সবসময় নাক মুখ ঢেকে চলাচল করতে হবে।
- ✓ যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগীর সঙ্গে কথা বলার সময় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

RH ফ্যাক্টর

- **স্বামী-স্ত্রীর রক্ত কেমন হওয়া উচিত:** স্বামীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ নেগেটিভ যেকোনো একটি হলেই হবে। তবে স্বামীর রক্তের গ্রুপ যদি পজেটিভ হয় তবে স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ অবশ্যই পজেটিভ হতে হবে।

- **রক্তের Rh ফ্যাক্টর এক না হলে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে:** স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ আর স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে শরীরে লিথাল জিন বা মারণ জিন নামে একটি জিন তৈরি হয় যা তাদের মিলনে সৃষ্ট জাইগোটকে মেরে ফেলে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মৃত বাচ্চার জন্ম হয়। স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ হলে সন্তানের রক্তের গ্রুপও পজিটিভ হয়ে থাকে। স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ আর স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হয়ে থাকলে স্ত্রী পজেটিভ গ্রুপের একটি ফিটাস বা ভ্রুণ ধারণ করে থাকে। ডেলিভারির সময়ে পজেটিভ ফিটাসের ব্লাড, প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার বা ভ্রুণফুল displacement ঘটবে। এর ফলে স্ত্রীর শরীরে নতুন ব্লাড গ্রুপের একটি আর এইচ এন্টিবডি তৈরি হবে। এটি প্রথম সন্তানের জন্মের সময়ে কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বের সন্তান জন্মের সময়ে তৈরি হওয়া Rh এন্টিবডি শরীরের ভ্রূণের প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ারকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এর ফলে দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ কিংবা মৃত সন্তানের জন্ম হতে পারে। একে মেডিকেলের ভাষায় আরএইচ incompatibility বলা হয়। এর প্রতিকারের জন্য Rh- মাকে Anti-D নামে একটি ইনজেকশন নিতে হবে রুটিনমাফিক, প্রথম বাচ্চা জন্মের পরপরই অথবা প্রথমবার গর্ভপাতের পরে। এই Anti-D মা'র রক্তে উপস্থিত Rh+ রক্তকোষকে ধ্বংস করে, যাতে এগুলো আর কোন এ্যান্টিবডি তৈরি করতে না পারে। কোনো কোনো সময়ে এটা গর্ভকালীন সময়েও দেয়া হয়ে থাকে, সাধারণত ২৪তম থেকে ৩৬তম সপ্তাহের মধ্যে।

DDT ও মানব শরীরে এর প্রতিক্রিয়া

❑ মানব শরীরে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া:

- ডিডিটির বিষক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাশয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- এর ফলে মানুষ স্নায়ুবিক শৈথিল্য সমস্যায় ভুগতে শুরু করে।
- ডিডিটির প্রভাবে বিশেষ করে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধদের স্নায়ুঘটিত আলঝেইমার রোগের ঝুঁকি ও ব্যাপকতা বাড়ে।
- ডিডিটি মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- যদি কোনো মা ডিডিটি মিশ্রিত খাদ্য বেশি মাত্রায় গ্রহণ করে তবে ঐ মায়ের শালদুধের মাধ্যমে সন্তানেরও ক্ষতি হয়। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপির মধ্যে পার্থক্য লিখুন। থেরাপি দুটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো লিখুন।
  [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- কীভাবে ঔষধ ছাড়া রক্তে চিনি ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় লিখুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- খাদ্যে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণই কী রক্তে কোলেস্টেরল কমানোর উপায়? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- মানুষের রোগনিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যরক্ষায় আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?
  [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ও আলট্রাসনোগ্রাফি কী ধরনের রোগ নির্ণয়ে সক্ষম উল্লেখ করুন।
  [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিবডির-এর পার্থক্য লিখুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- LDL ও HDL কী? মানবদেহে এদের কাজ বর্ণনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- রক্তের Rh ফ্যাক্টর কী? এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ডেঙ্গু জ্বরের কারণ ও লক্ষণসমূহ লিখুন। ডেঙ্গু ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার রোধে আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর নয় কেন? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- রাতকানা রোগ কী? কী কারণে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয় বিস্তারিত আলোচনা করুন। এ রোগ প্রতিকারে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- খাদ্যাভ্যাস শরীরের ওজন বাড়ায় পরবর্তীতে তা কীভাবে ডায়বেটিস-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- চারটি পানিবাহী রোগের নাম লিখুন। বেরিবেরি রোগের কারণ কী? সূর্যরশ্মিতে ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়-ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- রক্ত কণিকাসমূহ কী কী? রক্ত লাল দেখায় কেন? হেপাটাইটিস কী? কী কারণে হেপাটাইটিস হয়? রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিক দুটি হেপাটাইটিস ভাইরাসের নাম লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- অ্যান্টিসেপটিক কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত তিনটি উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিসেপটিকের নাম লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

লেকচার-০৮

এসিড ও ক্ষার সম্পর্কিত লুইস তত্ত্ব

❑ অম্ল

যা H+ উৎপন্ন করে এবং ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে সাধারণভাবে অম্ল বলে।
যেমন: $H_2SO_4, H-COOH$

❑ ক্ষার ও ক্ষারক

ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড যা অম্লের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষার/ক্ষারক বলে। যেমন- N_aOH, FeO, NH_4OH

এসিড ও ক্ষার সম্পর্কিত লুইস তত্ত্ব

➢ অম্ল ও ক্ষার সম্পর্কিত সাধারণত তিনটি মতবাদ প্রচলিত-

এসিড ও ক্ষার সম্পর্কিত লুইস তত্ত্ব

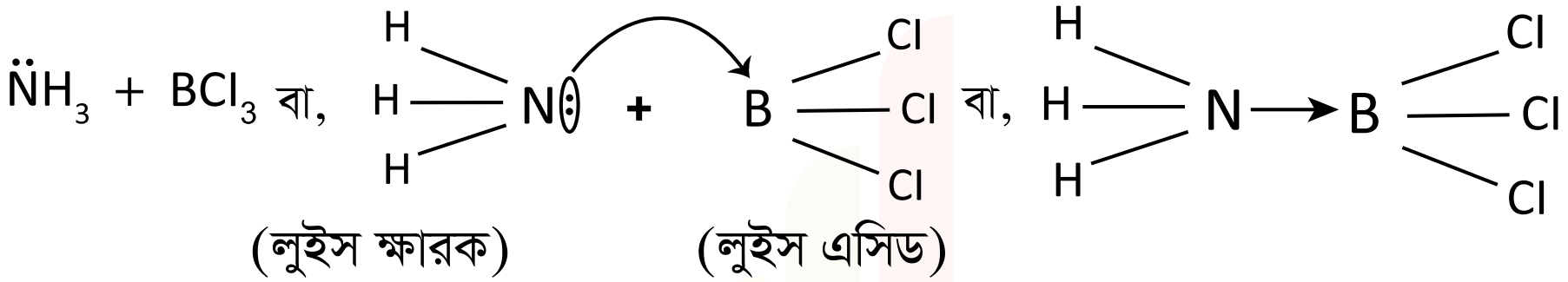

❑ লুইস তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা:

✓ এ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটনিক এসিড যেমন HCl, HNO_3, H_2SO_4 এদেরকে সরাসরি এসিড শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। যদিও বাস্তবে এরা এসিড। কারণ অবিয়োজিত এসিড অণুগুলো ক্ষারকের সাথে সন্নিবেশ বন্ধনে যুক্ত হতে পারে না।

✓ এ তত্ত্বের সাহায্যে এসিড বা ক্ষারককে তাদের আপেক্ষিক তীব্রতা অনুযায়ী সাজানো যায় না। কারণ একই লুইস এসিড যখন ভিন্ন ভিন্ন লুইস ক্ষারকের সাথে যুক্ত হয় তখন ঐ এসিডের তীব্রতার মাত্রা ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার একই লুইস ক্ষারক বিভিন্ন লুইস এসিডের সাথে বিক্রিয়া করলে ঐ ক্ষারকের তীব্রতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়।

লুইসের মতবাদ

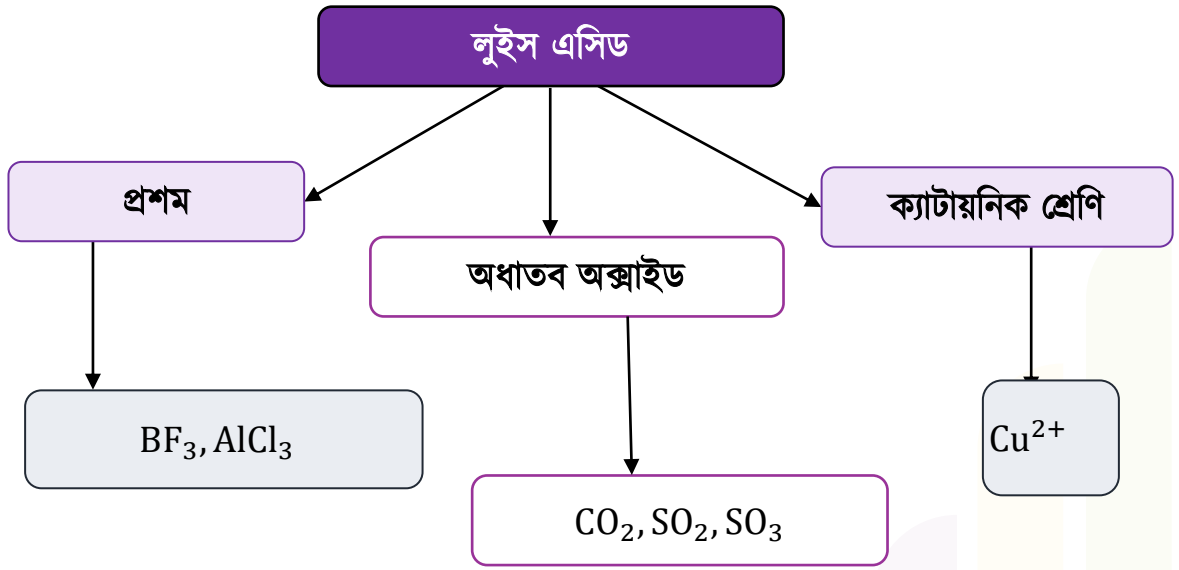
লুইস এসিড
প্রশম
অধাতব অক্সাইড
ক্যাটায়নিক শ্রেণি
$BF_3, AlCl_3$
CO_2, SO_2, SO_3
Cu^{2+}

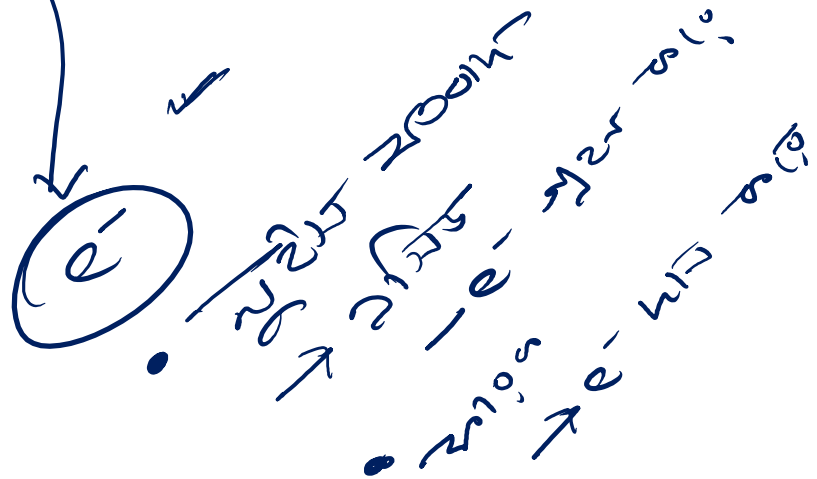

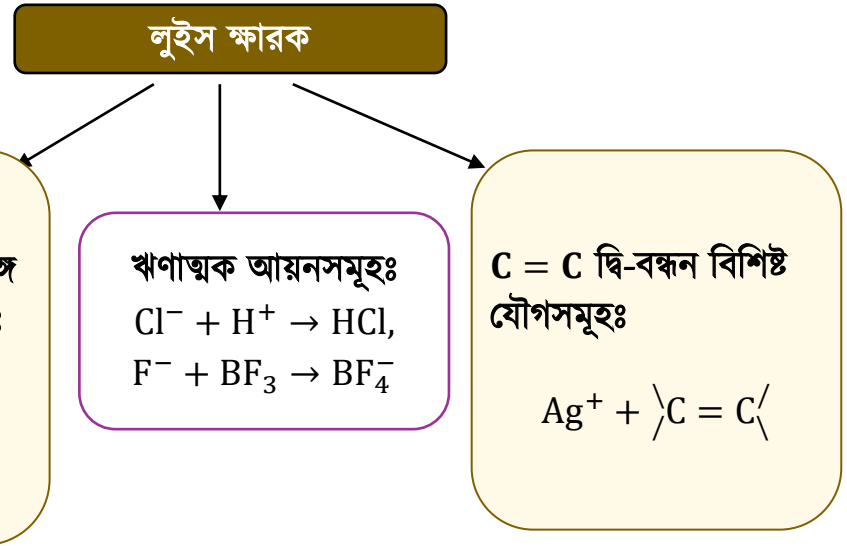
লুইস ক্ষারক
কেন্দ্রীয় পরমাণুতে নিঃসঙ্গ জোড় ইলেকট্রন বিশিষ্টঃ
$NH_3, PH_3, H_2O,$
H_2S, HF, HCl
ঋণাত্মক আয়নসমূহঃ
$Cl^- + H^+ \rightarrow HCl,$
$F^- + BF_3 \rightarrow BF_4^-$
$C = C$ দ্বি-বন্ধন বিশিষ্ট যৌগসমূহঃ
$Ag^+ + \backslash/C = C/\backslash$

এসিড ও ক্ষার সম্পর্কিত অ্যারহেনিয়াস তত্ত্ব

এসিড বা অম্ল: $HCl + aq \rightarrow H^+ + Cl^-$

ক্ষারক: $NaOH + aq \rightarrow Na^+ + OH^-$

❑ অ্যারহেনিয়াস তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা:

✓ অ্যারহেনিয়াস মতবাদে জলীয় দ্রবণে মুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, জলীয় দ্রবণে মুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) হাইড্রোনিয়াম মূলক (H_3O^+) হিসেবে অবস্থান করে।

✓ অ্যারহেনিয়াসের মতবাদ জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হলেও অজলীয় দ্রবণে কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ পানির অনুপস্থিতিতে এ মতবাদ অম্ল-ক্ষারক ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

✓ এ মতবাদ অনুযায়ী কেবল হাইড্রোক্সিল মূলক (OH^-) বিশিষ্ট যৌগগুলোকে ক্ষারক হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধাতব অক্সাইড, অ্যামোনিয়া (NH_3), অ্যালকাইল অ্যামিন ($R-NH_2$), ফিনাইল অ্যামিন বা অ্যানিলিন ($C_6H_5-NH_2$) ইত্যাদি যৌগের ক্ষারকীয় ধর্ম এ মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

✓ গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো যৌগের এসিড বা ক্ষারক ধর্ম এ মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{NH_3(g)} + \underset{\text{এসিড}}{HCl(g)} \longrightarrow \underset{\text{লবণ}}{NH_4Cl}$$

এসিড লবণ $FeSO_4$, $ZnSO_4$, $CuSO_4$, $AlCl_3$ এর জলীয় দ্রবণ কেন অম্লধর্মী এবং Na_2CO_3 এর জলীয় দ্রবণ কেন ক্ষারধর্মী হয় তা ব্যাখ্যা করতে এ মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

এসিড ও ক্ষার সম্পর্কিত ব্রনস্টেড ও লাউরি তত্ত্ব

এসিড বা অম্ল: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

ক্ষারক: যেসব যৌগ প্রোটন গ্রহণ করে তাদেরকে ক্ষারক বলে। যেমন: H_2O একটি প্রোটন গ্রহণ করে H_3O^+ তে পরিণত হয়। তাই H_2O একটি ক্ষারক।

- ✓ আরহেনিয়াসের মতবাদ কেবলমাত্র জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে এসিড ও ক্ষারক নির্দেশ করতে সক্ষম। পানির অনুপস্থিতে এসিড ও ক্ষারক নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ব্রনস্টেড-লাউরি মতবাদ অনুসারে এসিড ক্ষার শনাক্ত করতে পানির উপস্থিতি অপরিহার্য নয়।
- ✓ কিছু কিছু পদার্থ আছে (যেমন: NH_3, H_2O) যারা ক্ষারক, কিন্তু কেন তারা ক্ষারক তা আরহেনিয়াস মতবাদের সাহায্যে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু ব্রনস্টেড-লাউরির মতবাদের অনুসারে সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

এসিড ও ক্ষার সম্পর্কিত ব্রনস্টেড ও লাউরি তত্ত্ব

❑ ব্রনস্টেড-লাউরির তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা:

- ✓ এ তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন অধাতব অক্সাইড যেমন- CO_2, SO_2, NO_2 এদের এসিডিক ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় না। একইভাবে বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড যেমন Na_2O, CaO, BaO এদের ক্ষারকীয় ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় না।
- ✓ এ তত্ত্বের সাহায্যে BF_3, BCI_3, $AICI_3$, $FeCl_3$ প্রভৃতি যৌগের এসিড ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় না।
- ✓ এ তত্ত্বের এসিড-ক্ষারের বিক্রিয়া প্রোটনের গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবতা হলো অনেক এসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া আছে যেখানে প্রোটনের আদান-প্রদান আদৌ ঘটে না। এ ধরনের বিক্রিয়া এ মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

❑ অনুবন্ধী অম্ল ও অনুবন্ধী ক্ষারক:

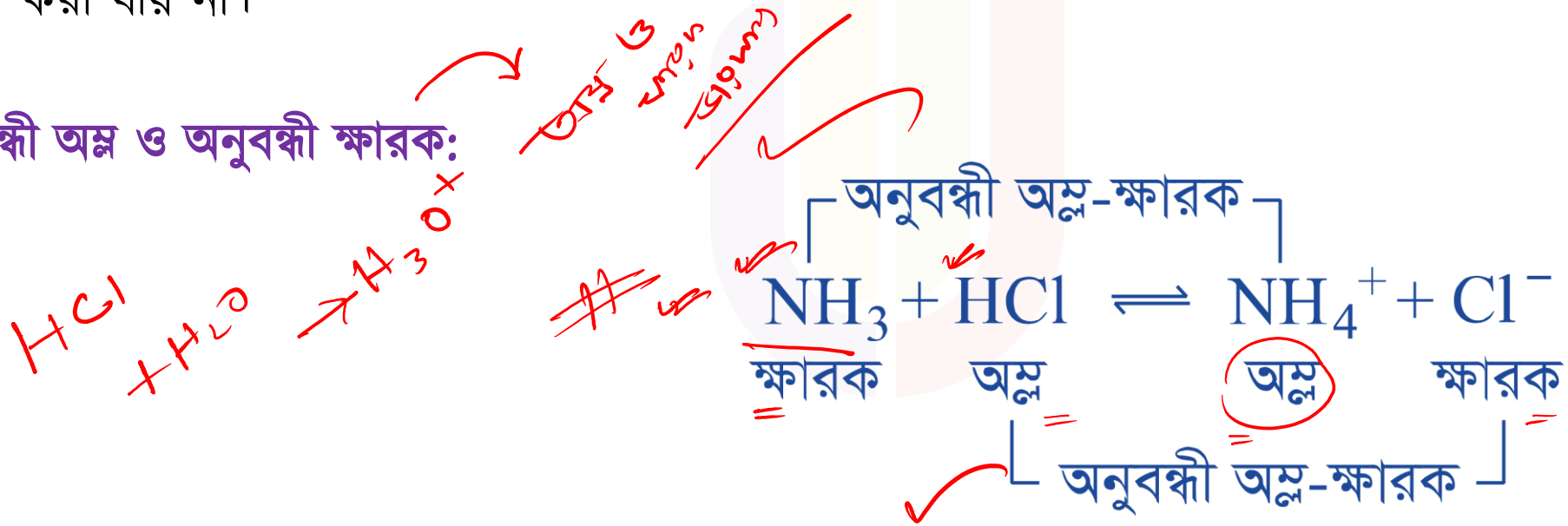

ব্রনস্টেড লাউরির মতবাদ

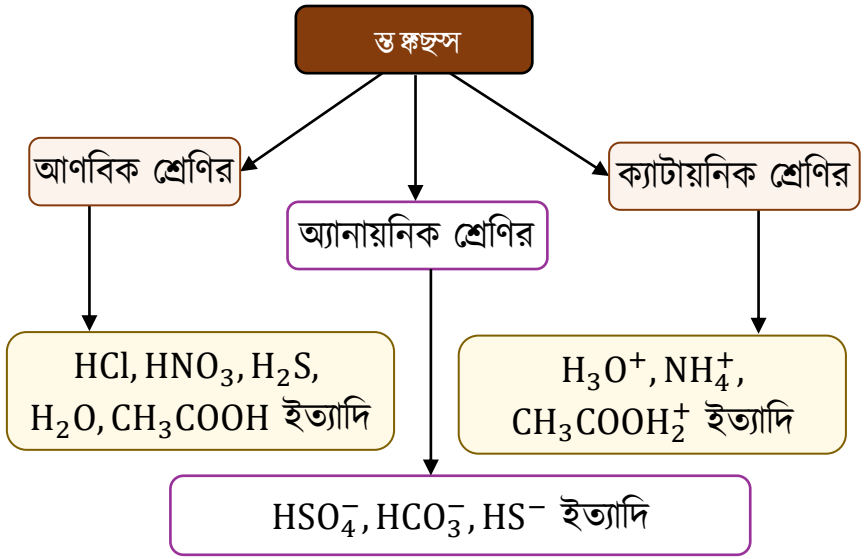

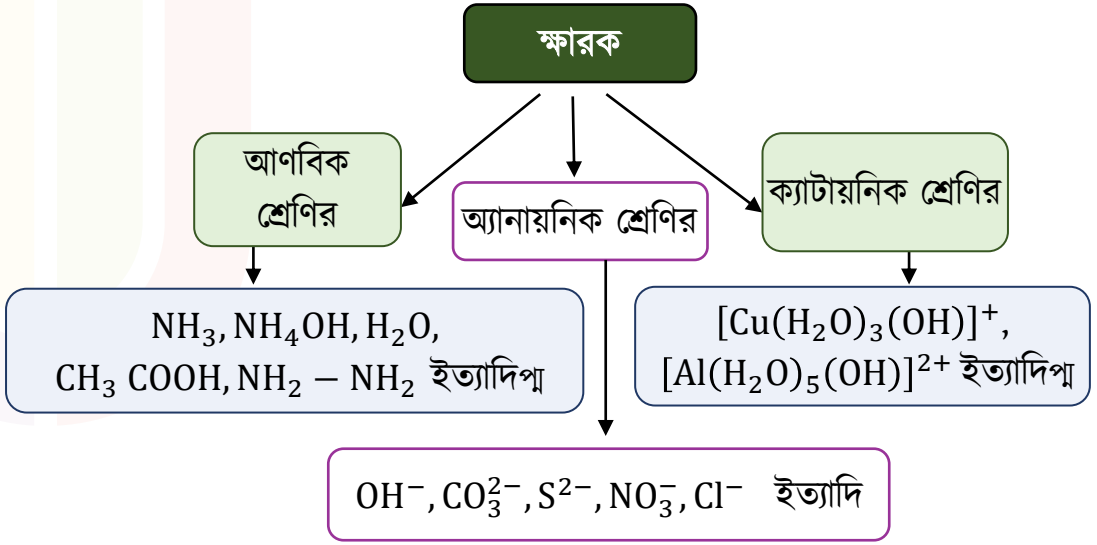

এসিড ও ক্ষার সম্পর্কিত

❑ নিম্নে কিছু জৈব এসিডের নাম ও উৎসের নাম উল্লেখ করা হলো:

জৈব এসিড	উৎস	জৈব এসিড	উৎস
ল্যাকটিক এসিড	দুধ, দই	অক্সালিক এসিড	টমেটো
এসিটিক এসিড	ভিনেগার/সিরকা	অ্যাসকরবিক এসিড	আমলকি
ট্যানিক এসিড	চা	ম্যালিক এসিড	আপেল, আনারস
টারটারিক এসিড	তেঁতুল	ফরমিক এসিড	পিঁপড়ার কামড়ে
সাইট্রিক এসিড	আঙ্গুর, কমলা, লেবু	ইরোসিক এসিড	সরিষার তেল

এসিডের বৈশিষ্ট্য

- দ্রবণে অন্য পদার্থকে প্রোটন দান করে।

$$HCl + \text{পানি} \rightarrow HCl\,(aq) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-\,(aq)$$

- এসিড ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{এসিড}}{HCl} + \underset{\text{ক্ষারক}}{NaOH} \rightarrow \underset{\text{লবণ}}{NaCl} + \underset{\text{পানি}}{H_2O}$$

- লঘু এসিড সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।
- এসিডের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবাহী।
- প্রায় সকল লঘু এসিড টক স্বাদযুক্ত।
- এসিড নীল লিটমাসে লাল রং প্রদান করে।

দৈনন্দিন জীবনে এসিডের কিছু ব্যবহার

- বিভিন্ন টক স্বাদযুক্ত ফল যেমন কমলা, লেবু, টমেটো, তেঁতুল ইত্যাদিতে এসিড থাকে যা আমাদের মুখে রুচি আনে, খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে, ভিটামিন-সি এর চাহিদা মেটায় এবং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- আমাদের পাকস্থলির দেয়াল থেকে যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন হয়, খাদ্য পরিপাকে তা আবশ্যক।
- টয়লেট পরিষ্কারে যেসব পরিষ্কারক ব্যবহার করা হয় তাতে এসিড থাকে।
- বহুল ব্যবহৃত ব্যাটারিতে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়।
- সাপের উপদ্রব কমানোর জন্য কার্বোলিক এসিড ব্যবহার করা হয়।
- ডিটারজেন্ট, নানা রকম রং, ঔষধ, কীটনাশক, পেইন্ট, কাগজ, বিস্ফোরক ও রেয়ন তৈরিতে H_2SO_4 ব্যবহৃত হয়।
- ইস্পাত তৈরির কারখানা, ঔষধ, চামড়া শিল্প ইত্যাদিতে HCl এসিড ব্যবহৃত হয়।
- সার কারখানা, বিস্ফোরক প্রস্তুত, খনি থেকে মূল্যবান ধাতু, যেমন: সোনা আহরণে ও রকেটে জ্বালানির সাথে নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ব্যবহৃত হয়।

ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য

- ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।
  এসিড + ক্ষারক → লবণ + পানি
- জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন প্রদান করে।
- ক্ষারের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবাহী।
- ক্ষার দ্রবণ কটু স্বাদ ও গন্ধযুক্ত।
- স্পর্শে সকল ক্ষার পিচ্ছিল অনুভূত হয়।
- ক্ষার দ্রবণ লাল লিটমাসে নীল রং প্রদান করে।

- **সকল ক্ষারই ক্ষারক, কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়:** ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড হলো ক্ষারক। আবার ক্ষারকগুলোর মধ্যে যে ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইডগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়ে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন দেয় তারা ক্ষার। পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে না এমন ক্ষারক ক্ষার নয়। সুতরাং দেখা যায় যে ক্ষারকের কিছু কিছু ক্ষার, সবগুলো নয়। ক্ষারকের উপর একটি অতিরিক্ত শর্ত 'পানিতে দ্রবণীয়তা' আরোপ করে ক্ষার পাওয়া যায়। $NaOH, Ca(OH)_2, NH_4OH$ এগুলো ক্ষার। কিন্তু এগুলোকে ক্ষারকও বলা যায়। পক্ষান্তরে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয় না। তাই এটি ক্ষারক হলেও ক্ষার নয়। অতএব, সকল ক্ষার ক্ষারক হলেও সকল ক্ষারক ক্ষার নয়।

এসিডের অপব্যবহার

এসিডের জারক ও নিরূদক ধর্মের অপব্যবহার সম্ভব। দুটো ক্ষেত্রেই তীব্র বিক্রিয়া হয় যা তাপ উৎপাদী এবং অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক। এসিডের হীনতম অপব্যবহার হলো প্রেমে ব্যর্থ পুরুষের প্রতিশোধমূলক এসিড নিক্ষেপ। নারীর সৌন্দর্য ধ্বংসের মাধ্যমে চরিতার্থ এই বিকৃত প্রতিশোধ-স্পৃহার পেছনে এসিডের বিধ্বংসী রাসায়নিক ধর্ম দায়ী নয়। বরং এর দায়ভার অসুস্থ মনস্তত্ত্বের মূর্খ সমীকরণের ওপর বর্তায়।

এই অপরাধ দমনকল্পে বাংলাদেশ ফৌজদারি দন্ডবিধিতে সংযুক্ত হয় এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২। এ আইনের ভিত্তিতে এসিড আক্রমণে যদি মৃত্যুসাধন হয় তবে ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

pH

কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন (H^+) বা হাইড্রোনিয়াম (H_3O^+) আয়নের মোলার ঘনমাত্রার ঋণাত্মক ১০ ভিত্তিক লগারিদমকে ঐ দ্রবণের pH বলে।

$$pH = -\log[H^+] \quad \text{বা,} \quad [H^+] = \text{antilog}(-pH) = 10^{-pH}$$

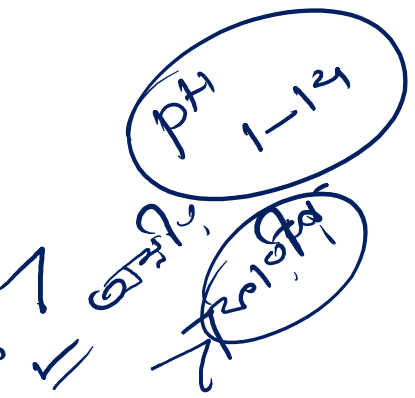

❑ pH এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা

✓ আমাদের ধমনির রক্তের pH হলো প্রায় ৭.৪। অর্থাৎ এটি সামান্য ক্ষারধর্মী। এর সামান্য ($\pm$০.৪) হেরফের হলে মারাত্মক বিপর্যয়, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। আবার আমাদের জিহ্বার লালার pH-এর মান ৬.৬-এর কাছাকাছি থাকলে তখন তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য দরকারি pH-এর মান হলো ২। এটি যথেষ্ট শক্তিশালী এসিডের পরিমাণ, কারণ খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো শক্তিশালী এসিড থাকে। এই মান ০.৫-এর মতো হেরফের হলেই তা বদহজম সৃষ্টি করে। আমাদের প্রস্রাবের pH-এর মান ৭-এর কম থাকা স্বাভাবিক।

pH

- ✓ মাটির pH সাধারণত ৪ থেকে ৮-এর ভেতর থাকে। অর্থাৎ এটি এসিডিক থেকে শুরু করে ক্ষারীয় হতে পারে। মাটির pH-এর মান ৩-এর কম অর্থাৎ বেশি অম্লীয় (Acidic) হলে মাটির অনেক দরকারি উপাদান যেমন: ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) মাটি থেকে চলে যায়। তার ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। এসিডিক মাটির জন্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্যদিকে মাটি খুব ক্ষারীয় হলে অর্থাৎ pH-এর মান ৯.৫-এর বেশি হলেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে Al^{3+} (অ্যালুমিনিয়াম আয়ন) সহজেই মাটি থেকে গাছের মূলে চলে যায় এবং এতে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ক্ষারীয় মাটির জন্য নাইট্রেট ও ফসফেট জাতীয় সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষার অর্থাৎ pH খুব কমে গেলে বা বেড়ে গেলে মাটিতে থাকা উপকারী অনেক অণুজীব মারা যায়, ফলে গাছপালার স্বাভাবিক জৈবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়।

- ✓ বিভিন্ন শিল্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় pH নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানা রকম ঔষধ, কলমের কালি, বেকারিতে, লজেন্স জাতীয় মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য, চামড়া প্রস্তুতি ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আলোকচিত্র সংক্রান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, রং তৈরি ও ব্যবহারে, ধাতব পদার্থের ইলেকট্রোপ্লেটিং এরকম হাজারো ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করা হয়। কোন মানের pH দ্রবণে কোন বর্ণ ধারণ করবে, তা বোঝার জন্য একটি চার্ট রয়েছে। একে ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্ট বলে। কোনো দ্রবণে কয়েক ফোঁটা ইউনিভার্সাল নির্দেশক যোগ করলে দ্রবণ যে বর্ণ ধারণ করে, সেই বর্ণ ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্টের বর্ণের সাথে মিলিয়ে দ্রবণের pH পরিমাপ করা হয়।

টাইট্রেশনের মাধ্যমে pH নির্ণয়

টাইট্রেশনের মাধ্যমে pH নির্ণয় করার জন্য দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা প্রয়োজন। যে দ্রবণের pH নির্ণয় করতে হবে তাকে বিকারে নিয়ে জানা ঘনমাত্রার অন্য একটা দ্রবণকে বিকারে নিয়ে টাইট্রেশন করে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়। টাইট্রেশনের মাধ্যমে ঘনমাত্রা নির্ণয় করার পর আমরা বিক্রিয়া মাধ্যম থেকে হিসাব করতে পারি কত মোল হাইড্রোজেন আয়ন অথবা হাইড্রক্সিল আয়ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের (OH^-) মোলার ঘনমাত্রা নির্ণয় করে দ্রবণের pH হিসাব করা যায়। pH নির্ণয় করার জন্য নিম্নের সমীকরণ দুটি ব্যবহার করা হয়:

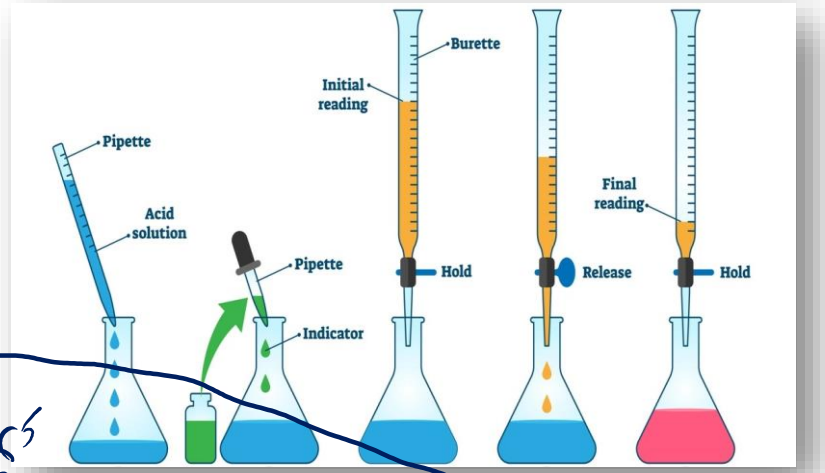

অম্লের pH নির্ণয় করার জন্য $pH = -\log[H^+]$

ক্ষারের ক্ষেত্রে, $p^{OH} = -\log[OH^-]$

অথবা, pH + pOH = 14 এই সমীকরণ থেকেও নির্ণয় করা যায়।

টাইট্রেশনের মাধ্যমে pH নির্ণয়

❑ **বাফার দ্রবণ:** যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষারক যোগ করার পরও দ্রবণের pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ দ্রবণের pH নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে, তাকে বাফার দ্রবণ বলে। বাফার দ্রবণ সাধারণত দুই রকম। যেমন:

✓ মৃদু এসিড ও ঐ এসিডের সঙ্গে তীব্র ক্ষারকের লবণের দ্রবণ মিশ্রিত বাফার দ্রবণ। এ ধরনের বাফারকে অম্লীয় বাফার বলে।

✓ কখনো কখনো মৃদু ক্ষার এর সঙ্গে তীব্র এসিড এবং ঐ মৃদু ক্ষারের লবণের দ্রবণ মিশিয়ে বাফার দ্রবণ তৈরি করা হয়। এ বাফারকে ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ বলে।

তবে এসিটিক এসিড ও সোডিয়াম এসিটেট দ্বারা তৈরি বাফার দ্রবণ সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়।

❑ **বাফার দ্রবণের pH নির্ণয়:** বাফার দ্রবণের pH নির্ণয় করা যায় হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাখ সমীকরণের সাহায্যে।

$$pH = P_{k_a} + \log \frac{[\text{লবণ}]}{[\text{অম্ল}]}$$

pH, বস্তুর pH -এর পরিমাপ এবং গুরুত্ব

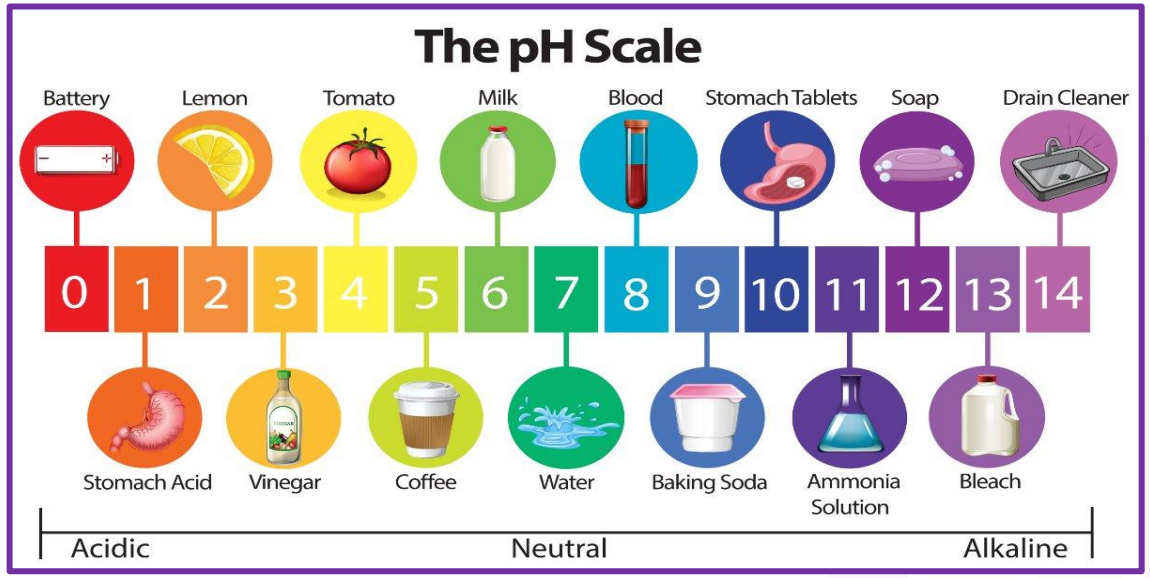

➲ pH এর গুরুত্বঃ

- Agriculture
- Health
- Water industry
- Toiletries
- Cosmetics

ACID-BASE INDICATORS

❑ নির্দেশক

যে সব পদার্থ নিজেদের বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো বস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারকত্বের মাত্রা নির্দেশ করে তাদেরকে নির্দেশক বলে।

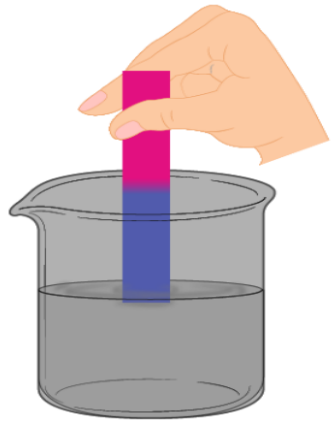

In an alkali, red litmus papers turns blue.

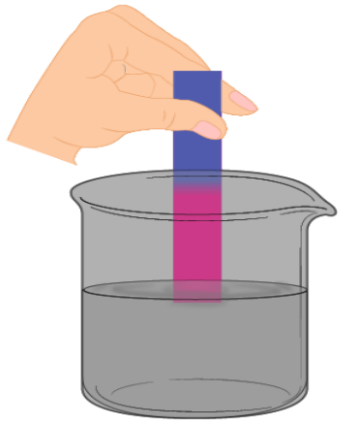

In an acid, blue litmus paper turns red.

নিম্নে কিছু বহুল ব্যবহৃত নির্দেশক ছক আকারে দেখানো হলো:

নির্দেশক	অম্লীয় মাধ্যমে বর্ণ	ক্ষারীয় মাধ্যমে বর্ণ	pH রেঞ্জ
লিটমাস	লাল	নীল	4.5 – 8.3
ব্রোমোফেনল	হলুদ	নীল	3 – 4.6
মিথাইল অরেঞ্জ	লাল	হলুদ	3.1 – 4.4
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ	4.4 – 6.3
ফেনলফথ্যালিন	বর্ণহীন	গোলাপি	8.2 – 10

পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটির কারণ এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন

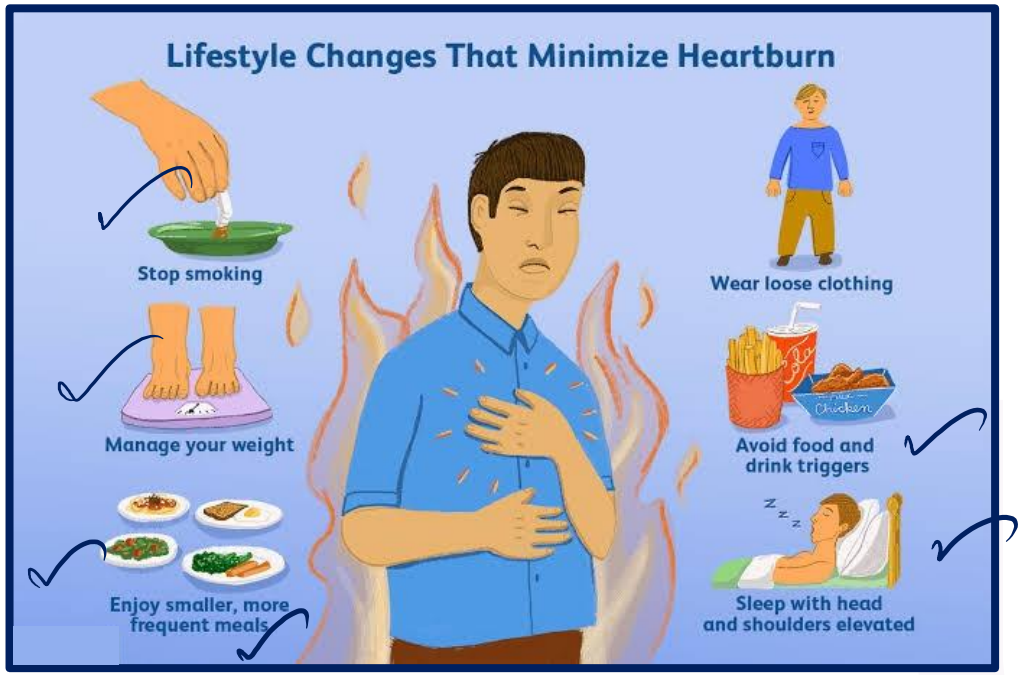

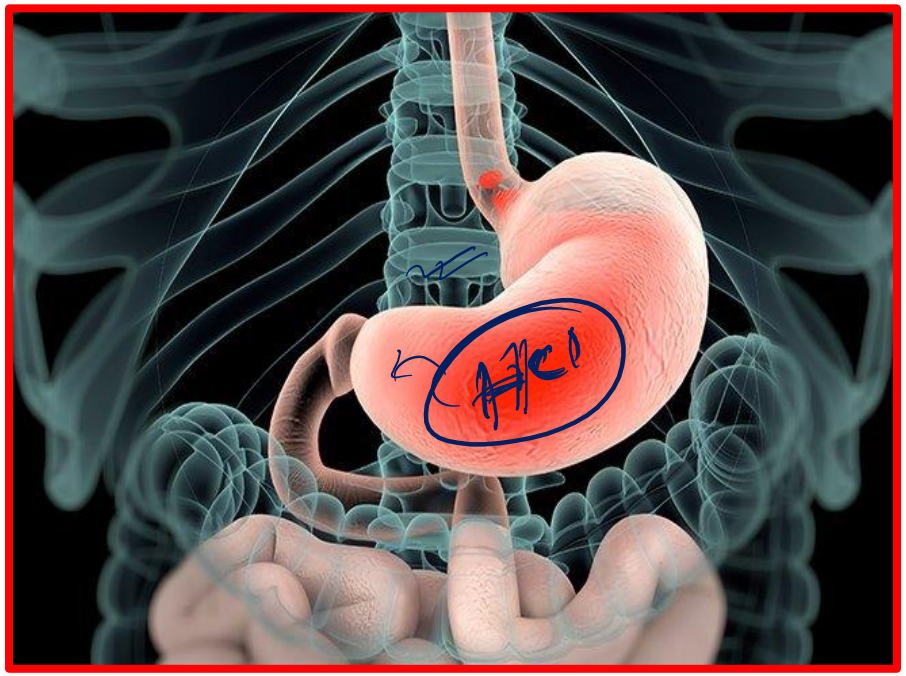

লবণ ও লবণের বৈশিষ্ট্য

❑ **প্রশমন বিক্রিয়া:** $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

❑ **লবণ:** এসিডের অনুস্থিত প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেনকে ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল যৌগমূলক দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করলে যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাকে লবণ বলে। যেমন: KCl।

➢ লবণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

✓ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় লবণ পানিতে দ্রবণীয়।

✓ লবণ বিভিন্ন মাধ্যমে পানি শোষণ করে।

✓ লবণ কঠিন কেলাস গঠন করে।

✓ লবণ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক।

✓ লবণ অনেক বেশি পরিমাণ আয়োডিন ধারণ করতে পারে।

✓ লবণ আয়নিত হয়ে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন গঠন করে।

লবণের ব্যবহার

- যে লবণ আমাদের খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করে তোলে, তা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$)।
- খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করার জন্য আরেকটি লবণ- মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট ব্যবহার করা হয়, যেটি 'টেস্টিং সল্ট' নামে পরিচিত।
- আমরা কাপড় কাচার যে সাবান ব্যবহার করি তা হলো মূলত সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$) আর শেভিং ফোম বা জেলে থাকে পটাশিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COOK$)। কাপড় কাচার সোডা হিসেবে ব্যবহৃত সোডিয়াম কার্বোনেটও (Na_2CO_3) একটি লবণ।
- জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত তুঁতে ($CuSO_4.5H_2O$) বা ফিটকিরিও একটি লবণ।

কৃষিতে লবণের ব্যবহার

- মাটির এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমরা যে চুনাপাথর ব্যবহার করি, এই চুনাপাথর একটি লবণ। আবার আমরা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যবহার করা হয়, তাদের বেশিরভাগই হলো লবণ। যেমন: অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), অ্যামোনিয়াম ফসফেট ($(NH_4)_3PO_4$), পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) ইত্যাদি।
- তুঁতে বা কপার সালফেট ($CuSO_4.5H_2O$) কৃষিজমিতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রতিরোধে বহুল ব্যবহৃত একটি লবণ। এটি শৈবালের বৃদ্ধি বন্ধে খুব কার্যকরী।

শিল্প-কারখানায় লবণ

- শিল্প-কারখানায় নানা কাজে খাবার লবণ অপরিহার্য। যেমন: চামড়াশিল্পে চামড়ার ট্যানিং করতে, মাখন ও পনিরের শিল্পোৎপাদনে, কাপড় কাচার সোডা ও খাবার সোডা তৈরি করতে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজে খাবার লবণ ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু লবণ যেমন: তুঁতে ($CuSO_4.5H_2O$), মারকিউরিক সালফেট ($HgSO_4$), সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4) শিল্প-কারখানায় প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টেক্সটাইল ও রং তৈরির কারখানায় রং পাকা করার কাজে লবণ প্রয়োজন হয়।
- রাবার প্রস্তুতিতে লবণ ব্যবহার করে রাবারকে (ল্যাটেক্স) রাবার গাছের নির্যাস থেকে আলাদা করা হয়।
- ঔষধ কারখানায় স্যালাইন এবং অন্যান্য ঔষধেও লবণ ব্যবহৃত হয়।
- ডিটারজেন্ট তৈরিতেও ফিলার হিসেবে লবণ খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃষিতে, শিল্প-কারখানায় লবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জারণ ও বিজারণ

- **জারণ:** $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ **(ইলেকট্রন দান বা জারণ)**
- **বিজারণ:** $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ **(ইলেকট্রন গ্রহণ বা বিজারণ)**
  - **জারক:** যেসব মৌল, মূলক বা আয়ন বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তারা হচ্ছে জারক। যেমন- $O_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2, K_2Cr_2O_7, KMnO_4, HNO_3, H_2SO_4$, সকল পার-অক্সাইড, পার অক্সি এসিড এবং তাদের লবণসমূহ।
  - **বিজারক:** যে সব মৌল মূলক বা আয়ন বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন বর্জন বা ত্যাগ করে তাকে বিজারক বলে। যেমন- সব ধাতু, হাইড্রোজেন, কার্বন ইত্যাদি।
- **জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া:** যে বিক্রিয়ায় এক সঙ্গে জারণ ও বিজারণ সংঘটিত হয়, তাকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বা রিডক্স বিক্রিয়া বলে। $2Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl(s)$

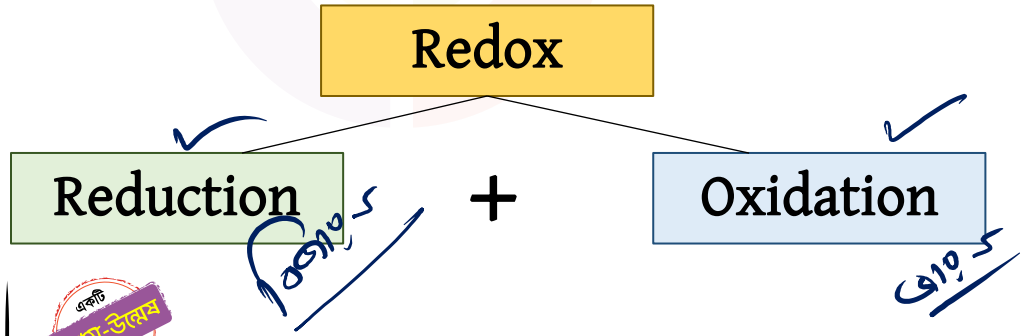

H_2O একটি উভধর্মী পদার্থ

❑ এসিড হিসেবে : $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$

❑ ক্ষারক হিসেবে : $HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$

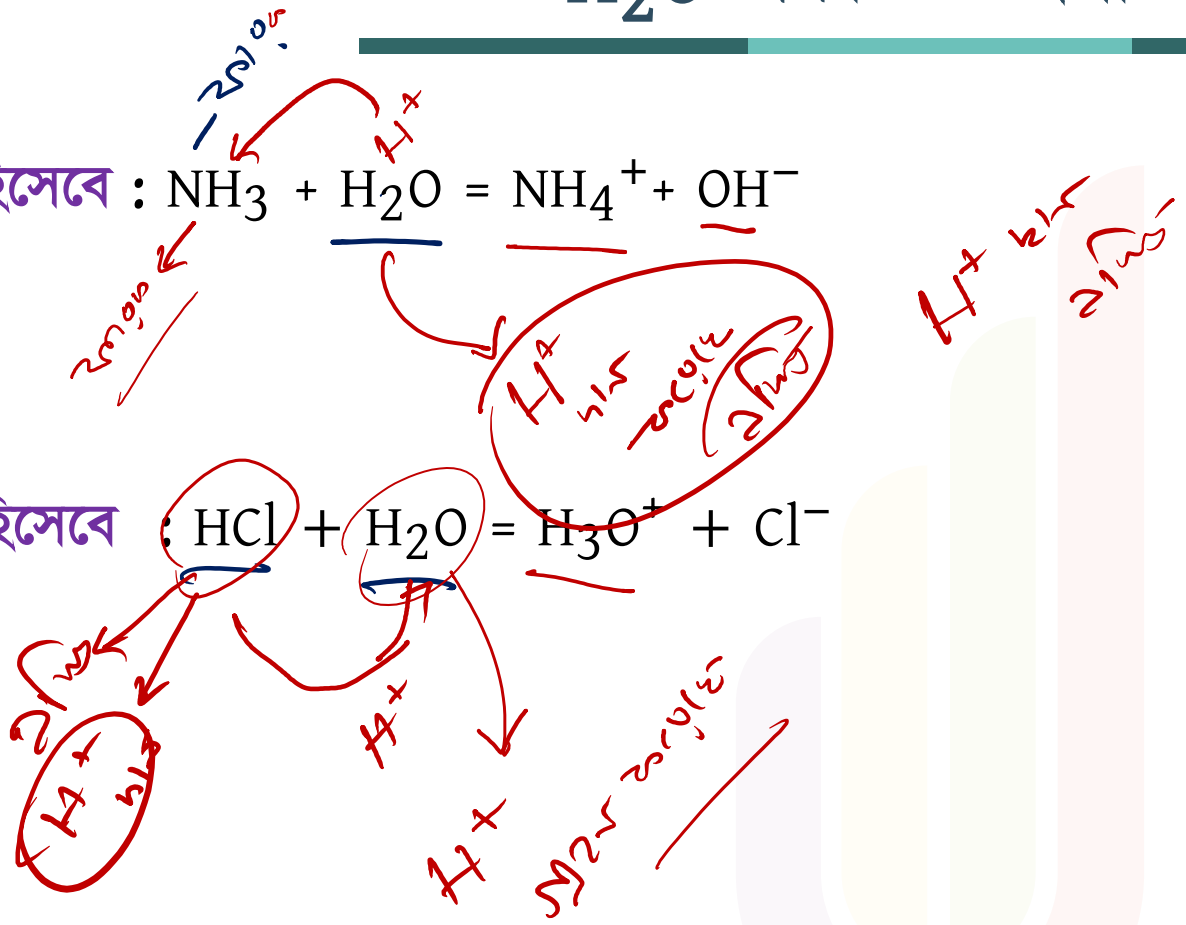

মরিচা

❑ মরিচা

সাধারণ লোহা বা লোহার তৈরি কোন জিনিসকে আর্দ্র বাতাসে দীর্ঘদিন রেখে দিলে এর উপরিভাগে বাদামী বর্ণের সহজে অপসারণযোগ্য একটি আবরণ সৃষ্টি হয়, যার ফলে লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং লোহার স্বাভাবিক চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যায়। লোহার উপর সৃষ্ট এই বাদামী বর্ণের আবরণকে মরিচা বলে। অর্থাৎ মরিচা হল আর্দ্র ফেরিক অক্সাইড ($Fe_2O_3.3H_2O$)।

বাতাসে থাকা অক্সিজেন আর জলীয়বাষ্পের সাথে লোহার বিক্রিয়ায় মরিচা তৈরি হয়। তাই মরিচা রোধ করতে হলে লোহাকে অক্সিজেন ও জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শ থেকে পৃথক রাখতে হয়। এজন্য সাধারণত রঙের প্রলেপ অথবা ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ব্যবহার করা হয়। আবার লোহার (৭৪%) সাথে ক্রোমিয়াম (১৮%) ও নিকেল (৮%) মিশিয়ে সংকর ধাতু স্টেইনলেস স্টিল তৈরি করা হয়। যা দীর্ঘদিন মরিচা প্রতিরোধ করতে পারে। লোহাকে গলিত দস্তায় ডুবিয়ে লোহার উপর দস্তার পাতলা প্রলেপ দেয়া হয়।এতে লোহার ওপর মরিচা পড়তে পারে না। এভাবে কোনো ধাতুর ওপর দস্তার প্রলেপ দেয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে।

$$\mathbf{4Fe + 10H_2O + O_2 \rightarrow 2(Fe_2O_3 : 3H_2O) + 4H_2}$$

বেকিং পাউডার

$$CO_2 + NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4HCO_3$$

$$NH_4HCO_3 + NaCl \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$$

❑ **বেকিং সোডার ব্যবহার:** কেক প্রস্তুতির সময় ময়দার মধ্যে বেকিং পাউডার মিশিয়ে তাপ প্রদান করা হয়। বেকিং সোডা পাউডার মিশ্রিত টারটারিক এসিডের ($C_4H_6O_6$) সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম টারটারেট ($C_4H_4Na_2O_6$), CO_2 গ্যাস এবং H_2O উৎপন্ন করে। এই CO_2 গ্যাস এর জন্য কেক ফুলে উঠে।

$$2NaHCO_3 + C_4H_6O_6 \rightarrow C_4H_4Na_2O_6 + 2CO_2 + 2H_2O$$

এসিড বৃষ্টি

সাধারণভাবে বৃষ্টির পানি কিছুটা এসিডিক বা অম্লীয়। কারণ বায়ুমণ্ডলের CO_2 এর কিছু পরিমাণ বৃষ্টির পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির পানিতে H_2SO_4, HNO_3, HCl প্রভৃতি এসিড মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এক্ষেত্রে পানির pH মান 3.5 থেকে 5.5 হয়ে যেতে পারে। এরূপ বৃষ্টির পানিকে এসিড বৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানিতে উল্লিখিত এসিডগুলোর পরিমাণ নির্ভর করে সেখানকার বায়ুতে উপস্থিত $SO_2(g)$, $NO_2(g)$, $HCl(g)$ ইত্যাদির পরিমাণের উপর। এসিড বৃষ্টিতে সব থেকে বেশি ভূমিকা রাখে H_2SO_4 (60 – 65%), তারপর HNO_3 (30 – 35%), সবচেয়ে কম ভূমিকা রাখে HCl । এসিড বৃষ্টির কারণ হিসেবে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই দায়ী।

শিল্প-কারখানা অঞ্চলে বৃষ্টির পানির সাথে যে এসিডিক অধঃক্ষেপ মাটিতে পতিত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শিল্প-কারখানা থেকে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে যথাক্রমে সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড তৈরি করে। যা বৃষ্টির সময় বৃষ্টির পানিতে মিশে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়-

$$2NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$$

$$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$$

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

এসিড বৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব

✓ **মাটির ওপর প্রভাব:** স্বাভাবিকভাবেই এসিড বৃষ্টির প্রভাবে মাটির pH মান কমে যায়। অর্থাৎ অম্লত্ব গুণ বেড়ে যায়। মাটির অম্লত্ব গুণ বেড়ে গেলে মাটিতে বর্তমান বিভিন্ন অজৈব লবণগুলোর দ্রাব্যতা মানের পরিবর্তন ঘটে। মাটির pH মানের পরিবর্তনের সাথে সাথে মাটিতে আয়ন বিনিময়ে বাধার সৃষ্টি হয়। pH মান কমে গেলে মাটিতে বিভিন্ন জৈব উপাদানগুলোর পচন কমে যায়। মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণী, সূক্ষ্ম অণুজীবগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মরে যায়। ফলে মাটি থেকে উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়। ফলে মাটিতে আর শস্য উৎপন্ন হতে পারে না। মাটি তার স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলে। মাটি সম্পূর্ণভাবে চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

✓ **জলজ প্রাণীর ওপর প্রভাব:** পানির নির্দিষ্ট pH মানের ওপর ভিত্তি করে পানিতে মাছ, জলজ জীবাণু ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বেঁচে থাকে ও বংশবিস্তার করে। এসিড বৃষ্টির কারণে পানির pH মান কমে গিয়ে এসব জলজ প্রাণিকূলের জীবন বিপন্ন করে তুলে, অনেক প্রাণী মারা যায়। এসিড বৃষ্টির কারণে জলাশয়ের নিকটবর্তী মাটিতে উপস্থিত বিষাক্ত লবণগুলো দ্রবীভূত হয়ে জলাশয়ে এসে পড়ে। এ প্রভাব আরো মারাত্মক। পানির pH মানের পরিবর্তন ঘটলে জলজ প্রাণীরা বংশবিস্তার করতে পারে না। চট্টগ্রামের হালদা নদীর পানির pH মান নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে এটি প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন উৎস। সাধারণভাবে পানির pH মান 4 এর কম হলে ঐ জলাশয়ের আর কোনো সজীব প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না।

এসিড বৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব

✓ **বনাঞ্চলের ওপর প্রভাব:** এসিড বৃষ্টির কারণে বিস্তৃত বনাঞ্চলের ক্ষতি হয়। এসিড বৃষ্টি সরাসরি গাছের পাতার ওপর পড়লে পাতার সবুজ কোষ নষ্ট হয় এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এসিড বৃষ্টির কারণে মাটির অম্লত্ব বেড়ে গিয়ে এবং অণুজীবগুলো ধ্বংস হয়ে উদ্ভিদজগতকে বিপন্ন করে তোলে। মাটি থেকে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণে বাধার সম্মুখীন হয়। উদ্ভিদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

✓ **মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব:** শরীরের ত্বকের ওপর এসিড বৃষ্টি পড়লে ত্বকের কোষের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বৃষ্টির পানিতে এসিডের পরিমাণ বেশি হলে ত্বকের ওপর ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

রাজঅম্ল/অম্লরাজ/অ্যাকোয়া রিজিয়া

❑ **রাজঅম্ল:** তিন ভাগ আয়তনের গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং এক ভাগ আয়তনের নাইট্রিক এসিডের মিশ্রণকে অ্যাকোয়া রিজিয়া বা রাজঅম্ল বলে। রাজঅম্লে নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড যে জায়মান ক্লোরিন উৎপন্ন করে তা স্বর্ণ, প্লাটিনাম, সীসা প্রভৃতিকে দ্রবীভূত করতে পারে, তাই স্বর্ণ শিল্পে রাজঅম্ল ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ, প্লাটিনাম প্রভৃতি ধাতু HNO_3 বা HCl এ দ্রবীভূত হয় না কিন্তু রাজঅম্লতে দ্রবীভূত হয়।

1 $HNO_3 + 3HCl$.

বিক্রিয়া:

$$HND_3 + 3HCl \rightarrow NOCl\ [Cl] + 2H_2O$$

$$pt + 4[cl] \rightarrow pt\ cl_4$$

$$pt\ cl_4 + 2HCl \rightarrow H_2pt\ Cl_2$$

প্লাটিনিক ক্লোরাইড — ক্লোরো প্লাটিনিক এসিড

তাপমাত্রার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তর

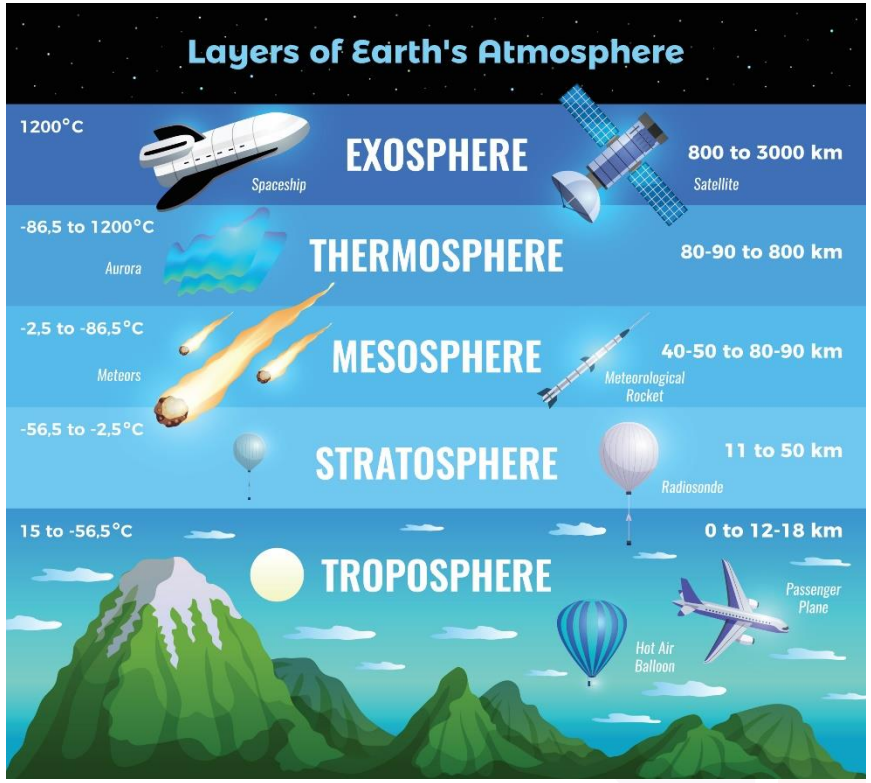

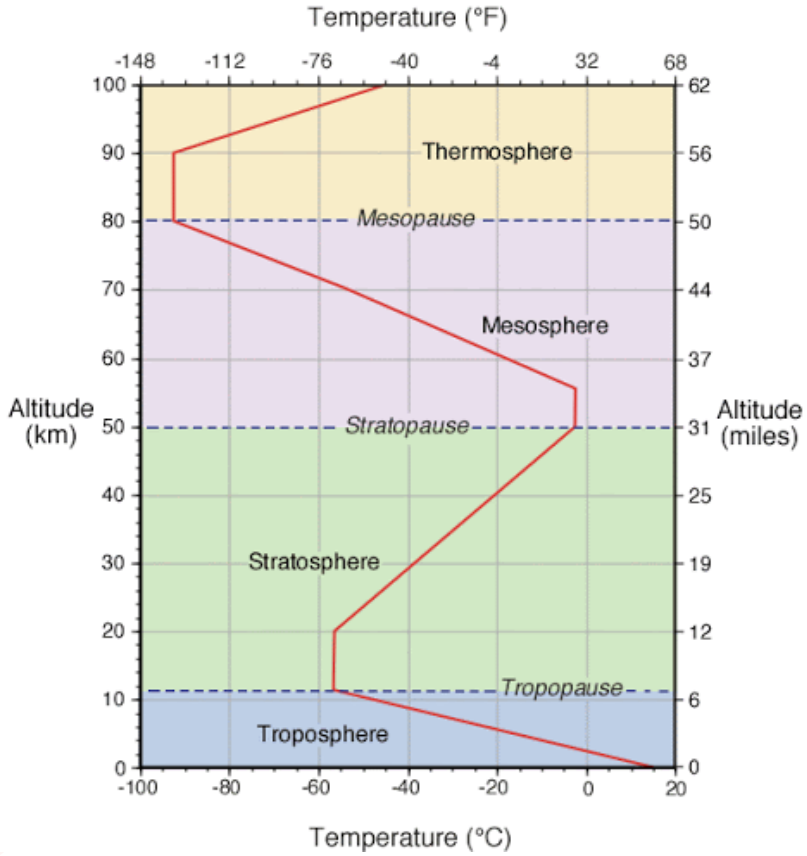

বায়ুমণ্ডল

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আর্গন (Ar)	০.৮০
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)	০.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, ওজোন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০২
জলীয়বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১
মোট	**১০০.০০**

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য

ট্রপোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Troposphere):

- ✓ ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব ও উষ্ণতা কমতে থাকে। সাধারণভাবে প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়।
- ✓ উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়।
- ✓ নিচের দিকের বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে।
- ✓ ধূলিকণার অবস্থানের ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজনের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ এই স্তর বহন করে।
- ✓ যে উচ্চতায় তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাকে ট্রপোবিরতি বলে। এখানে তাপমাত্রা –৫৪° সেলসিয়াসের নিচে হতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য

❑ স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Stratosphere):

- ✓ এই স্তরেই ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর বেশি আছে। এ ওজোনস্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet Rays) শুষে নেয়। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- ✓ এই স্তরের বায়ুতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনোরকম জলীয়বাষ্প থাকে না। ফলে আবহাওয়া থাকে শান্ত ও শুষ্ক। ঝড়বৃষ্টি থাকে না বলেই এই স্তরের মধ্যে দিয়ে সাধারণত জেট বিমানগুলো চলাচল করে।
- ✓ প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা পুনরায় হ্রাস পেতে শুরু করে। এটি স্ট্রাটোমণ্ডলের শেষ প্রান্ত নির্ধারণ করে।

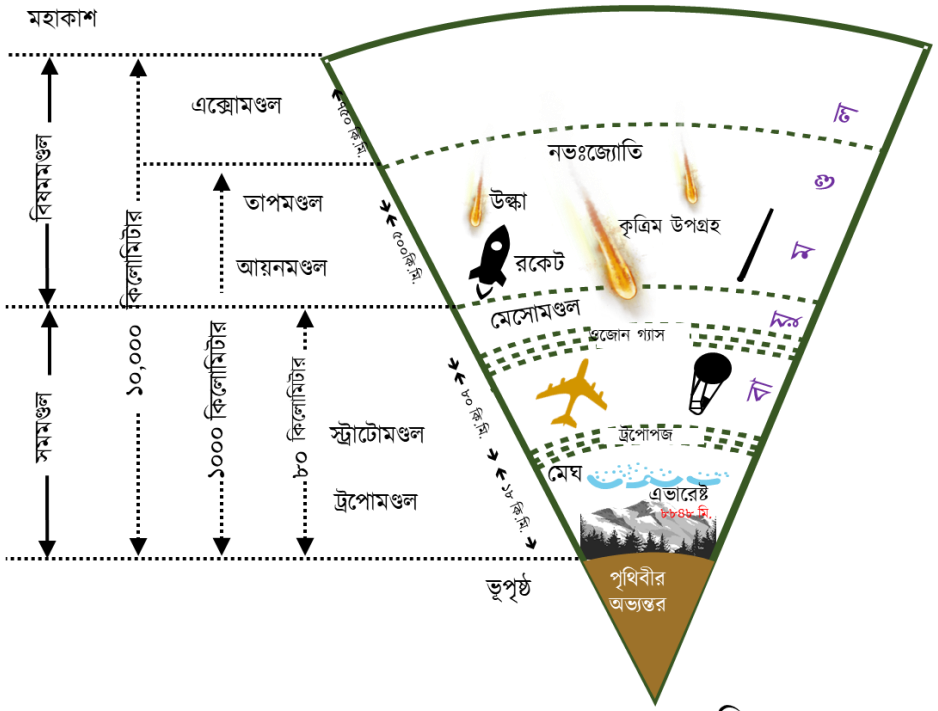

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য

❑ মেসোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the mesosphere):

✓ এই স্তরে ট্রপোমণ্ডলের মতোই উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে। যা –৮৩° সেলসিয়াস পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। মেসোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে।

✓ মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলোর অধিকাংশই এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায়।

❑ তাপমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Themosphere):

✓ এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮০° সেলসিয়াসে পৌঁছায়।

✓ তাপমণ্ডলের উপরের স্তরে তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে।

✓ তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়।

✓ ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বিভিন্ন বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য

❑ আয়নস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য:

- ✓ এই স্তরের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম যা সূর্য রশ্মির প্রভাবে আয়নিত অবস্থায় থাকে।
- ✓ এটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উষ্ণতম স্তর। এই স্তরের উষ্ণতা ২০০০°C ছাড়িয়ে যায়। এই কারণে এই স্তরের নাম থার্মোস্ফিয়ার।
- ✓ এই স্তরের থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
- ✓ এই স্তরের আয়নিত কণাগুলির জন্য এক ধরনের আলো সৃষ্টি হয় যাকে মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা বলে।
- ✓ পৃথিবীর বাইরের কোনো বস্তু এই স্তরের দ্বারা প্রতিহত হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যার ফলে উল্কা পৃথিবীতে আসতে পারে না।
- ✓ এই স্তরে সূর্য ও মহাজাগতিক রশ্মি নিষ্ক্রিয় বস্তুকে আয়নিত করে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য

❑ এক্সোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Exosphere):

- ✓ এ স্তর ক্রমান্বয়ে আন্তঃগ্রহ স্থান (Interplanetary Space) এ প্রবেশ করে।
- ✓ এ স্তরের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০° সেলসিয়াস থেকে ১৬৫০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়।
- ✓ এ স্তরে খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস যেমন- অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং হিলিয়াম ধারণ করে, কেননা মাধ্যাকর্ষণের ঘাটতির কারণে গ্যাস অণু বা কণাগুলো সহজে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

ওজোনস্তর অবক্ষয়

ওজোন অক্সিজেনের একটি রূপভেদ। এর সংকেত O_3। ওজোনের রং গাঢ় নীল এবং গন্ধ মাছের আঁশটে গন্ধের মতো। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোমণ্ডলে ওজোনের একটি স্তর অবস্থিত।

বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর সূর্যের আলোর ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মির (Ultraviolet rays) বেশির ভাগই শুষে নেয়। সূর্য রশ্মিতে ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থাকে। যার প্রভাবে চর্ম, ক্যান্সার, চোখে ছানিসহ নানাবিধ রোগ হতে পারে। ফলে মানুষসহ জীবজন্তু অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকারক দিক হতে রক্ষা পায়। ওজোনস্তর অবক্ষয় ১৯৭০ এর দশক থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীর স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোনস্তর আয়তনে প্রতি দশকে ৪% হ্রাস পাচ্ছে এবং এর বেশির ভাগই ঘটছে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে। সম্প্রতি একে ওজোনস্তরের ছিদ্র (Ozone hole) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ঘটনাটি ওজোনস্তরের ওজোন অণুর হ্যালোজেন (ক্লোরিন, ফ্লোরিন প্রভৃতি) দ্বারা প্রভাবকীয় ক্ষয়ের ফলে হয়ে থাকে।

CFC দ্বারা ওজোনস্তর ক্ষয়

$$CF_2Cl_2 \xrightarrow{uv} CF_2Cl + Cl$$

$$O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$$

$$ClO + O_3 \rightarrow Cl + 2O_2$$

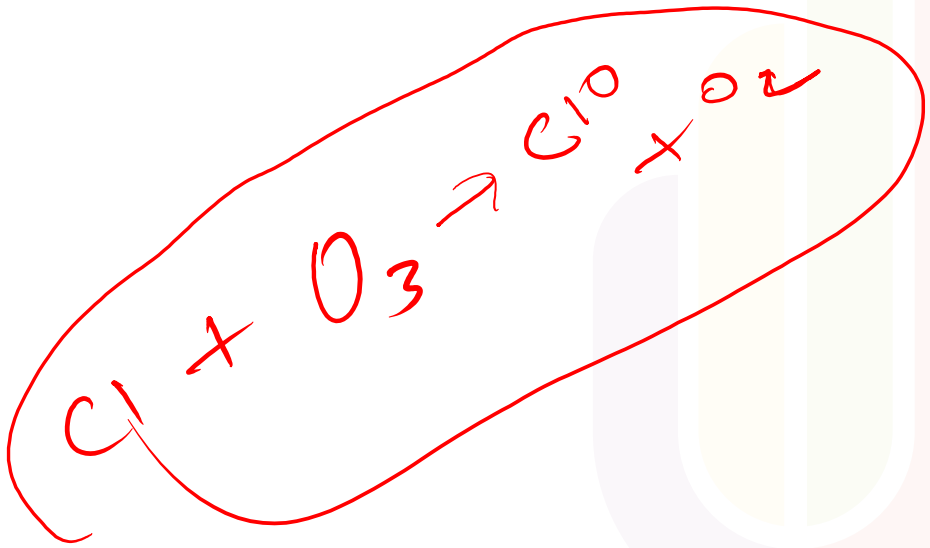

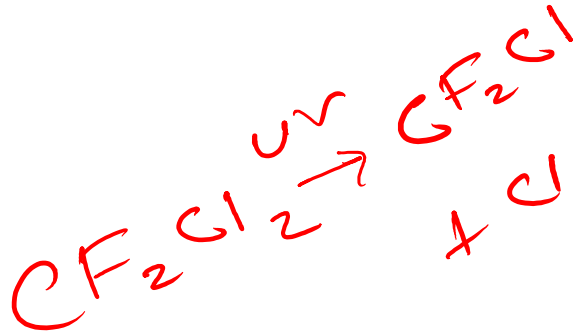

জোয়ার ভাটার কারণ

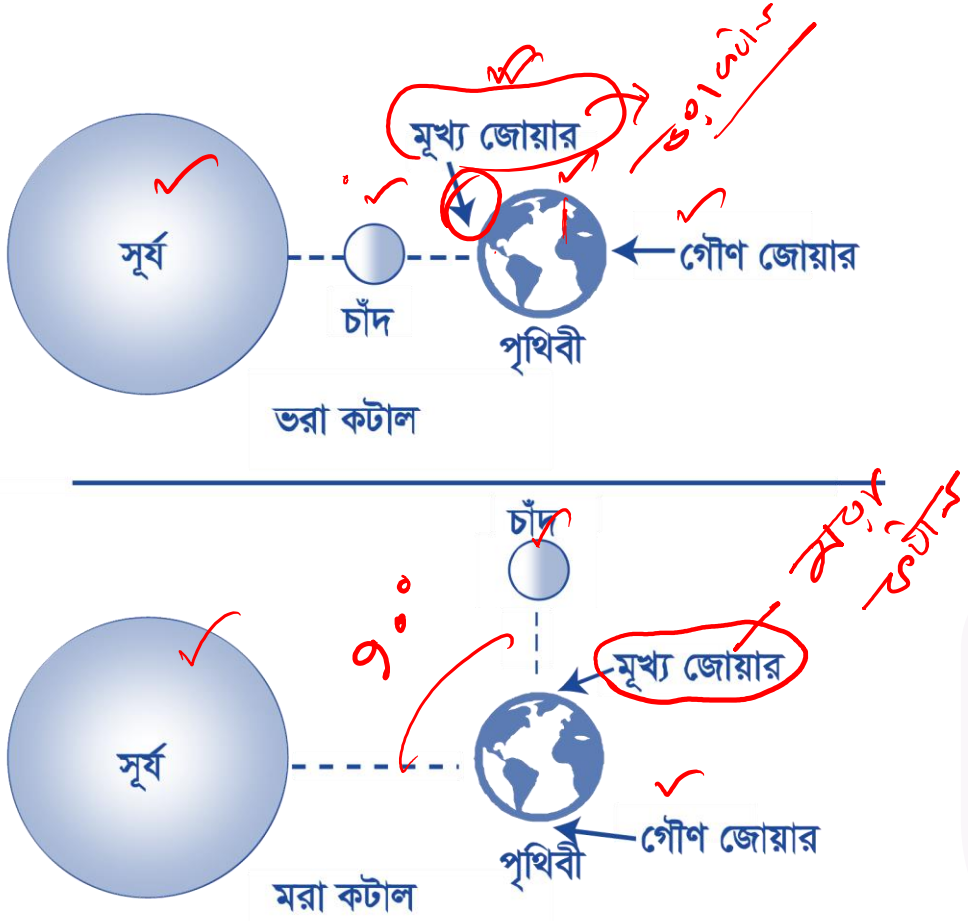

চিত্র: বিভিন্ন ধরনের জোয়ার ভাটা

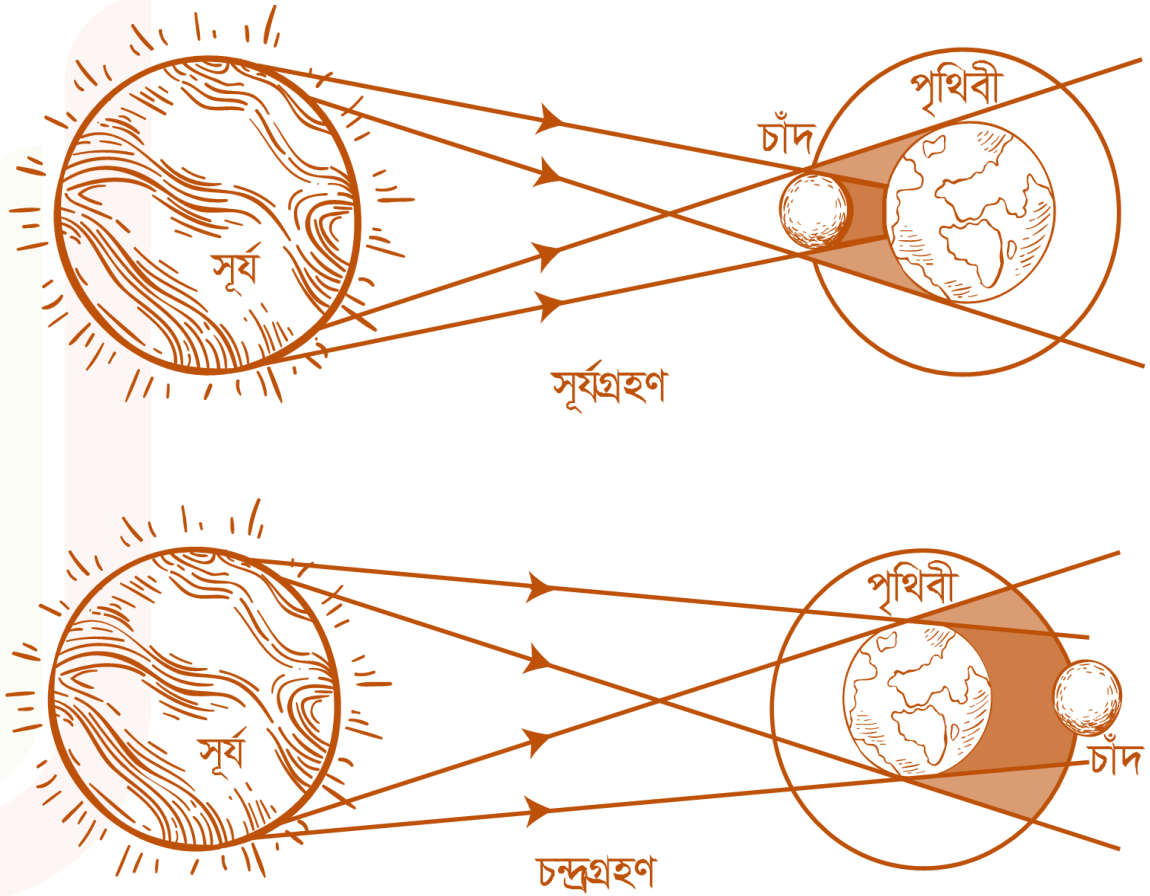

জোয়ার ভাটার কারণ

❖ **চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব:** মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রতিটি জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই এর প্রভাবে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পৃথিবীর উপর সূর্য অপেক্ষা চাঁদের আকর্ষণ বল বেশি হয়। কারণ সূর্যের ভর অপেক্ষা চাঁদের ভর অনেক কম হলেও চাঁদ সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত। তাই সমুদ্রের জল তরল বলে চাঁদের আকর্ষণেই প্রধানত সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে ও জোয়ার হয়। সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার তত জোরালো হয় না। চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে চাঁদ ও উভয়ের আকর্ষণে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়।

❖ **পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি:** পৃথিবী নিজ মেরুরেখার চারদিকে অনবরত আবর্তন করে বলে কেন্দ্রাতিগ শক্তি বা বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর প্রতিটি অণুই মহাকর্ষ শক্তির বিপরীত দিকে বিকর্ষিত হয় বা ছিটকে যায়। তাই পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে যেখানে মহাশক্তির প্রভাবে জোয়ার সৃষ্টি হয়, তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের জল বিক্ষিপ্ত হয়েও জোয়ারের সৃষ্টি করে।

OXYGEN CYCLE

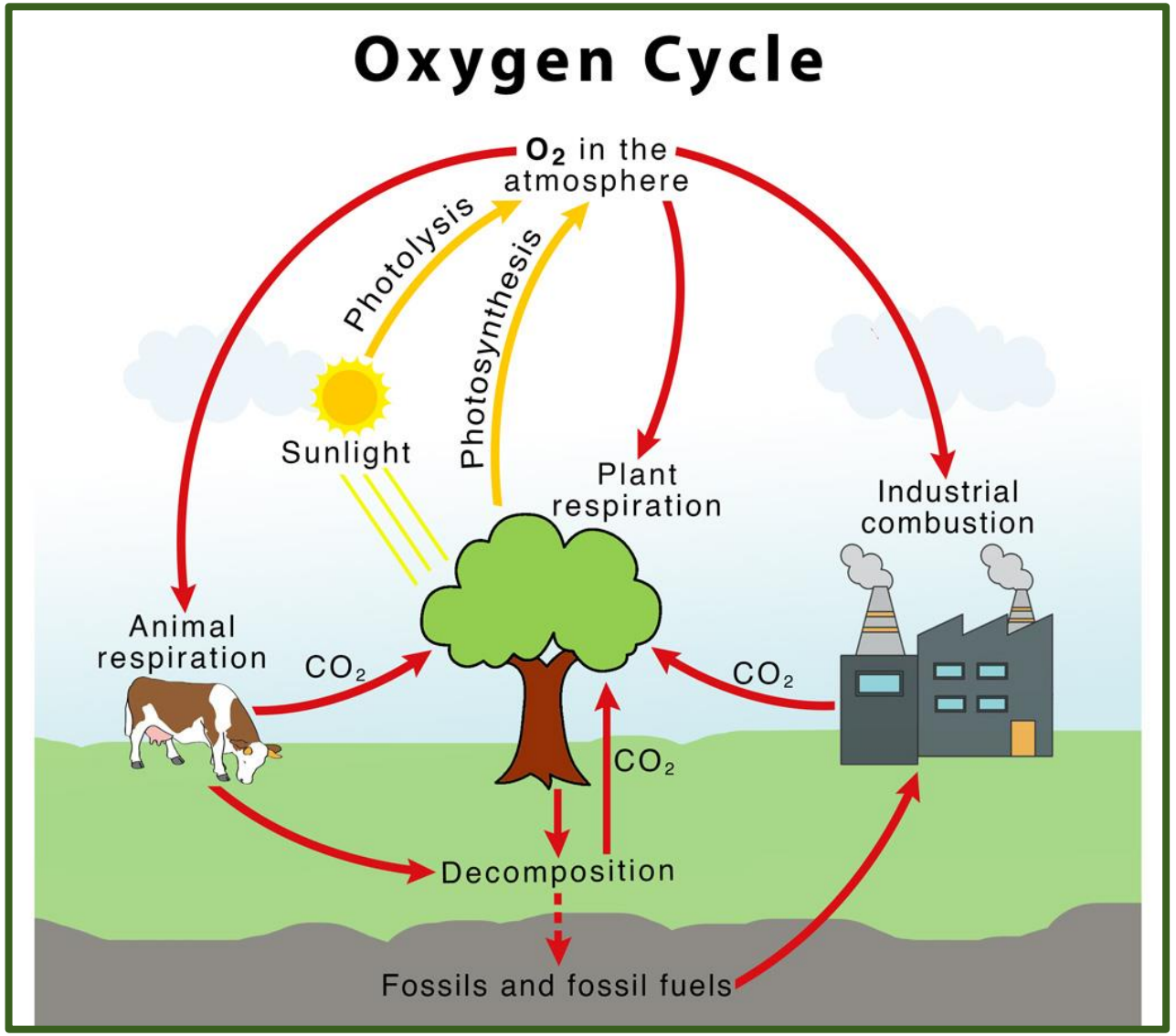

কার্বন চক্র

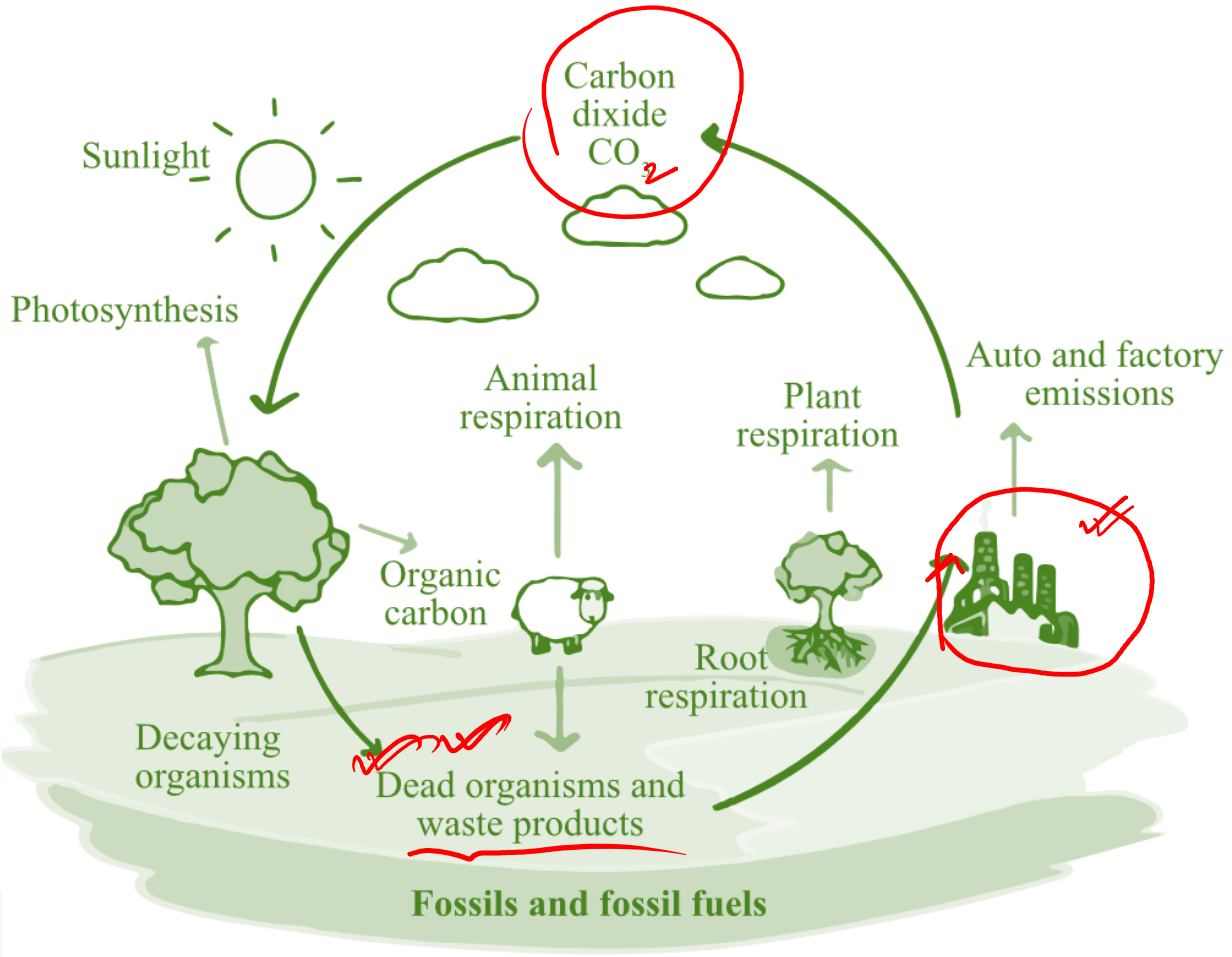

চিত্র: কার্বন চক্র

নাইট্রোজেন চক্র

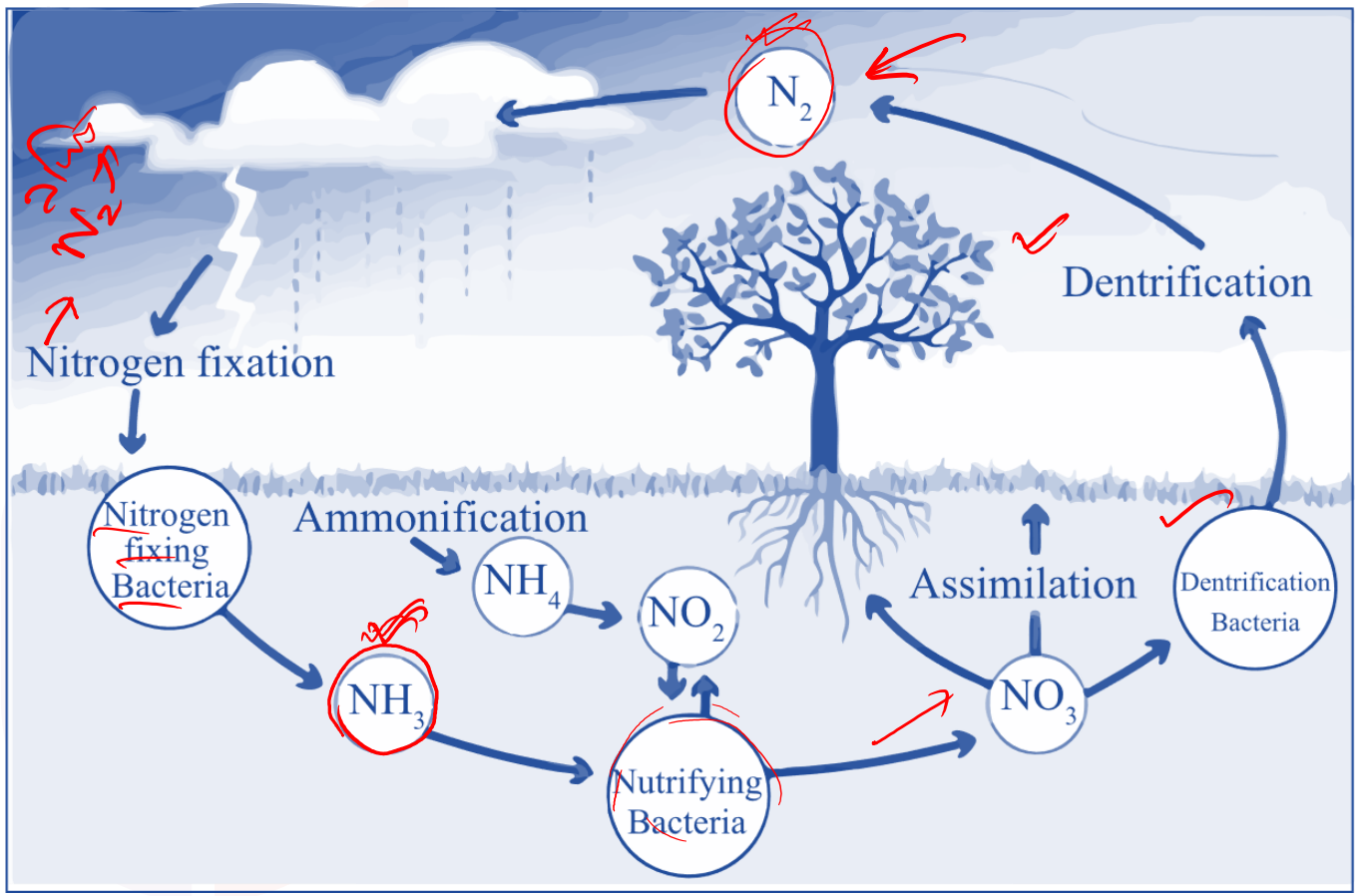

চিত্র : নাইট্রোজেন চক্র

মিঠা পানির উৎস ও গুরুত্ব

উৎস	শতকরা হার
✓ হিমবাহ ও তুষার আচ্ছাদন (glacier and snow cover)	74%
✓ ভূগর্ভস্থ পানি (under ground water)	22.2%
✓ বিভিন্ন হ্রদ (different lakes)	0.3%
✓ বায়ুতে যা বৃষ্টিরূপে আসে (rains)	0.035%
✓ বিভিন্ন নদী (rivers)	0.03%

❑ **মিঠা পানির গুরুত্ব:** একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের ভরের প্রায় 70% হলো পানি। মিঠা পানি ছাড়া মানুষের জীবনধারণ সম্ভব নয়। এজন্য পানির অপর নাম জীবন। হ্রদ, নদী ও ভূগর্ভস্থ মিঠা পানিকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনমতো বিশোধন করে গৃহস্থালীর কাজে, শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিকাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি। প্রতিদিন একজন মানুষের কমপক্ষে 1.6 লিটার বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়।

প্রতিটি শিল্প কারখানায় প্রচুর মিঠা পানি প্রয়োজন হয়। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় পাহাড়ি নদী বা হ্রদের মিঠা পানি।

পাস্তুরায়ন

পাস্তুরায়ন অর্থ আংশিক নির্জীবকরণ। দুধের গুণাগুণ অপরিবর্তিত রেখে স্বল্প সময়ের জন্য দুধকে উত্তপ্ত করে দুধের মধ্যস্থ কেবল ফসফেটেস (phosphatase) এনজাইমকে বিনষ্ট এবং দুধে থাকা সম্ভাব্য বিভিন্ন রোগজীবাণু (যেমন- আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদির জীবাণুকে) নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়াকে পাস্তুরায়ন (Pasteurisation) বলে। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ১৮৬২ সালে এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারকের নামানুসারে এ পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে। কাঁচা দুধ সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ বা পাস্তুরায়ন না করলে দুধে ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, ইস্ট এবং ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। এজন্য কাঁচা দুধে পাস্তুরাইজেশন করা হয়।

- ✓ **Holder পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে দুধকে 63°– 66°C তাপমাত্রায় অনধিক 30 মিনিট উত্তপ্ত করে দ্রুত 10°C এ শীতল করা হয়।
- ✓ **HTST পদ্ধতি:** HTST পদ্ধতিতে দুধকে দ্রুত 74°C তাপমাত্রায় 15 সেকেন্ড উত্তপ্ত করে 10°C এ শীতল করা হয়। এরূপে পাস্তুরিত দুধে ইস্ট, মোল্ড, ফসফটেজ এনজাইম বিনষ্ট হয় এবং ব্যাকটেরিয়া ও সম্ভাব্য রোগজীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়। বাংলাদেশে বৃহত্ত কোম্পানির পাস্তুরিত দুধ এ পদ্ধতিতে প্যাকেট করে ফ্রিজে সংরক্ষণ এবং পরে বাজারজাত করা হয়। নিম্নে Holder ও HTST পদ্ধতিতে পাস্তুরাইজেন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে দেখানো হলো:

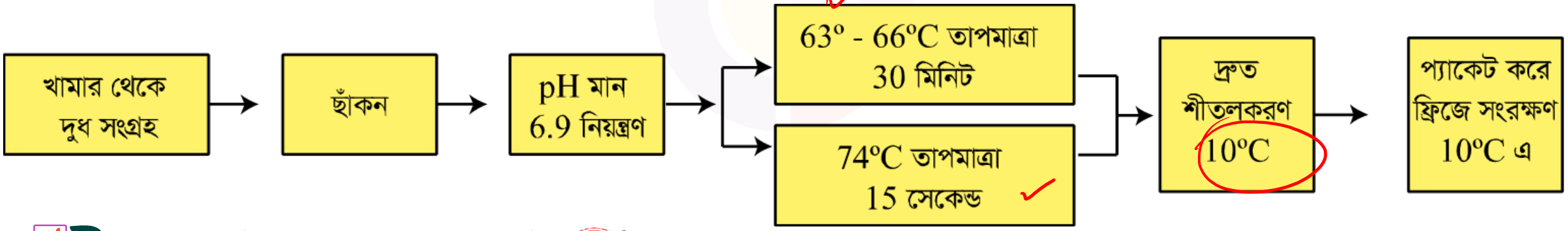

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ওজোন স্তরের গুরুত্ব কী? এটি কীভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]
- জৈব এসিড ও খনিজ (অজৈব) এসিডের মধ্যে পার্থক্য কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪৫তম বিসিএস লিখিত]
- রাজ অম্ল বা অ্যাকোয়া রেজিয়া কাকে বলে? এর ব্যবহার কী? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]
- বাফার দ্রবণ কী? CH_3COOH এবং CH_3COONa এর সমমোলার দ্রবণ কীভাবে বাফার হিসাবে কাজ করে? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]
- টাইট্রেশনের মাধ্যমে দ্রবণের pH নির্ণয় করা যায় কীভাবে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- জারণ ও বিজারণ একই সাথে ঘটে।- উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তিত হয় কেন? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়।– ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- সীতাকুণ্ড ট্র্যাজেডির সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ❑ পুরো বায়ুমণ্ডলের ভর কত? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ শতকরা পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলোর নাম লিখুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ পরিবেশের জন্য ট্রপোমণ্ডলের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ বায়ুর উপাদানসমূহ কী কী? বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস উল্লেখ করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ ওজোন গ্যাস কী? এই গ্যাস মানবদেহের কী ক্ষতি করে? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ কার্বন নিঃসরণ কী? বায়ুমণ্ডলে এর ক্ষতিকর প্রভাব ও তা নিয়ন্ত্রণের উপায় কী? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ এসিড ও ক্ষারের সংজ্ঞা দিন। এগুলোর দুটি আধুনিক তত্ত্ব উল্লেখ করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ pH কী? দুটি করে জৈব ও অজৈব এসিডের নাম লিখুন এবং তাদের pH সম্পর্কে মন্তব্য করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ❑ লবণ কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম ও উদাহরণ দিন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- অ্যাসিড ও ক্ষারের সংজ্ঞা লিখুন। [৪১তম, ৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- দুর্বল ও শক্তিশালী অ্যাসিডের তিনটি করে নাম লিখুন। [৪১তম, ৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- Pasteurization কী? Pasteurization করার পরও দুধ কক্ষ তাপমাত্রায় রাখলে নষ্ট হয়ে যাবার কারণ কী? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কী কী? যে কোনো দুটি স্তরের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- বায়ুমণ্ডলের O_2, CO_2 ও N_2 এর ভূমিকা কী? বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় কেন? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- জোয়ার ভাটা কী? দিনে দুবার জোয়ার ভাটা হয় কেন? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- এসিড ও ক্ষারকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। নির্দেশক কী? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- মানুষের শরীরে এসিডিটির কারণ এবং এর নিরাময়ে সঠিক খাদ্য নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy